h‰h¡Z£

A¡ëm q¡¢Lj

লেখক পরিচিতি

আনুমানিক ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল হাকিম সন্দ্বীপের সুধারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। তবে আব্দুল হাকিম মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি। কবি তাঁর কবিতায় বাংলা ভাষা ও স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক চেতনা 'নূরনামা' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যের নাম - ইউসুফ জোলেখা, লালমতি, সয়ফুল মুলুক, শিহাবুদ্দীননামা, নসীহৎনামা ইত্যাদি।

আনুমানিক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল হাকিম লোকান্তরিত হন।

পাঠ পরিচিতি

'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কবি আব্দুল হাকিমের 'নূরনামা' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' শব্দের অর্থ বঙ্গের বাণী বা বাংলা ভাষা। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষা বাংলা ও বাংলাদেশের প্রতি স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল হাকিমের এ চিন্তাধারা অগ্রসর ও আধুনিক।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কবির মাতৃভাষা প্রীতির পরিচয় লিখতে পারবেন।
- বাংলা বিদ্বেষীদের প্রতি কবির মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ॥
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন॥

আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।

যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত॥
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা-হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী॥
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ॥

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি''

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

কিতাব – বই, **মোতে** – আমার, **হাবিলাষ** – অভিলাষ, ইচ্ছা, **তে** – সে, **নিবেদি** – নিবেদন করি, **তোষি** – তুষ্ট করি, খুশি করি, **দেশী ভাষে** – দেশী ভাষায়, **ললাটে** – কপালে, **হিন্দে** – হিন্দুস্তানি ভাষায়, **ছিফত** – গুণ, **নিরঞ্জন** – যার কোন কলঙ্ক নেই, বিধাতা, **সর্ববাক্য বোঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী** – হিন্দুস্তানি ভাষাসহ সব ভাষাই বিধাতা বুঝতে পারেন, **বঙ্গদেশী বাক্য** – বাংলাবাক্য, **হিন্দুর অক্ষর** – হিন্দুর ভাষা। এখানে বাংলা ভাষার কথা বলা হচ্ছে, **বঙ্গবাণী** – বাংলা ভাষা, **দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়** – বাংলা ভাষা ও বিদ্যায় যার মন জুড়ায় না।

কাহিনী সংক্ষেপ

জনসাধারণ আরবি-ফারসি জানে না। তারা কেতাব কোরান পড়তেও জানে না। তাই কবি ধর্মের কথা, আল্লার কথা, মহানবীর কথা মাতৃভাষা বাংলায় বলেন। কেউ কেউ বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী বলে অবজ্ঞা করে। প্রত্যেক ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সব ভাষাই আল্লাহ বুঝতে পারেন। যারা মাতৃভাষা বাংলাকে ঘৃণা করে তাদের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে কবি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন কবির রচনা?
   ক. আলাওল　　খ. দৌলত কাজী
   গ. ভারতচন্দ্র　　ঘ. আব্দুল হাকিম

২. কোনটি আব্দুল হাকিম রচিত কাব্য?
   ক. খাবনামা　　খ. নূরনামা
   গ. লাইলি মজনু　　ঘ. মধুমালতী

৩. আব্দুল হাকিম কোন শতাব্দীর কবি?
   ক. সপ্তদশ　　খ. ত্রয়োদশ
   গ. চতুর্দশ　　ঘ. অষ্টাদশ

৪. 'বঙ্গবাণী' শব্দের অর্থ কি?
   ক. পূর্ব বঙ্গের ভাষা　　খ. উর্দুভাষা
   গ. বাংলা ভাষা　　ঘ. আরবি ভাষা

৫. কবি কাদের জন্ম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন?
   ক. যাঁরা আরবি-ফারসি ভাষাকে ঘৃণা করেন।　খ. যাঁরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন
   গ. যাঁরা দেশী ভাষায় কথা বলেন　　ঘ. যাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালবাসেন

খ. একটি শব্দে/বাক্যে উত্তর লিখুন।

১. আব্দুল হাকিম কোন যুগের কবি?
২. তিনি আনুমানিক কত খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
৩. 'হাবিলাষ' শব্দের অর্থ কী?
৪. বিধাতা কোন ভাষা বুঝতে পারেন?

৫. কবি ধর্মের কথা কোন ভাষায় বলতে চান?

গ. সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. আব্দুল হাকিম আধুনিক কালের কবি।
২. তিনি আরবি-ফারসি ভাষা বিদ্বেষী ছিলেন।
৩. বিধাতা সকলের ভাষা বুঝতে পারেন।
৪. যাঁরা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করেন কবি তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন।
৫. ভাষা সম্পর্কে কবির চিন্তা আধুনিক।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ঘ. আব্দুল হাকিম ২. খ. নূরনামা' ৩. ক. সপ্তদশ
৪. গ. বাংলা ভাষাটা ৫. যাঁরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন
খ. ১. মধ্যযুগের কবি ২. ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে ৩. অভিলাষ ৪. সকল ভাষা
৫. মাতৃভাষা বাংলায়
গ. ১. মি ২. মি ৩. স ৪. স ৫. স

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'বঙ্গবাণী' কবিতা অবলম্বনে মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি কবির অনুরাগের পরিচয় দিন।
২. বঙ্গবাণী কবিতার মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'বঙ্গবাণী' কবিতায় দেশী ভাষা বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
২. কবি বাংলা ভাষায় কাব্য চর্চা করতে চান কেন?
৩. যাঁরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন - কবি তাদের কী বলেছেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
২. মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'বঙ্গবাণী' কবিতা অবলম্বনে মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি কবির অনুরাগের পরিচয় দিন।

উত্তর : কবি আব্দুল হাকিম রচিত 'বঙ্গবাণী' একটি অনবদ্য কবিতা। বিষয়বস্তু বক্তব্যের গুণে ভাস্বর এ কবিতাটি আজও মুসলিম সমাজে দিক নির্দেশনার কাজ করছে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবির যে মাতৃভাষা প্রীতি ও স্বদেশের প্রতি যে ভালোবাসা ফুটে উঠেছে তা চিরকাল বাঙালির কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

'বঙ্গবাণী' শব্দটির অর্থ বাংলা ভাষা। এমন এক সময় ছিল যখন মুসলিম সমাজ বাংলাভাষাকে ধর্ম ও জ্ঞান চর্চার বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। আব্দুল হাকিম মধ্যযুগের কবি। কিন্তু আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তিনি এর ভ্রান্তি বুঝতে পেরেছিলেন। এ ভ্রান্তির কথাই তিনি বলেছেন 'বঙ্গবাণী' কবিতায়।

আরবি-ফারসিতে আল্লাহ ও নবীর গুণগান আছে। ইসলাম ধর্মের বহুগ্রন্থ এ ভাষা দুটিতে রচিত হয়েছে। কোরান নাজিল হয়েছে আরবিতে। কিন্তু যাঁরা আরবি-ফারসি জানেননা তাঁরা যদি মাতৃভাষায় ধর্মের কথা লেখেন ও বলেন তাতে কোন অন্যায় হয় না। বরং সকল মানুষ ধর্মের কথা শুনতে পারে ও বুঝতে পারে। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ বাংলা ভাষা বা মাতৃভাষায় ধর্মচর্চার ঘোর বিরোধী। তাঁরা বাংলা ভাষাকে ধর্মালোচনার অনুপযোগী মনে করেন ও একে হিন্দুয়ানী ভাষা বলতে চান। এদের বিরুদ্ধে কবি কঠোর মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন -

- যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।

- সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥

অর্থাৎ যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলাভাষাকে ঘৃণা করে। তাদের জন্মের পরিচয় নিয়ে কবি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এদেরকেই কবি স্বদেশ ছেড়ে অন্যদেশে যেয়ে বসবাস করতে বলছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্বদেশের প্রতি কবির প্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি যে ভালোবাসা ও অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা হয় না। এজন্য আব্দুল হাকিম মধ্যযুগের কবি হয়েও এ যুগের মানুষের কাছেও সমান প্রিয়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : বঙ্গবানী কবিতায় দেশীভাষা বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর : 'বঙ্গবাণী' আব্দুল হাকিম রচিত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ কবিতায় কবি মাতৃভাষা ও স্বদেশের গুণগান গেয়েছেন।

'দেশী ভাষা' মানে দেশে প্রচলিত ভাষা। মাতৃভাষাই সাধারণত দেশে প্রচলিত থাকে। তাই মাতৃভাষাই দেশী ভাষা। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। সে অর্থে মাতৃভাষা বাংলাকেই দেশী ভাষা বলেছেন।

প্রশ্ন : কবি বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করতে চান কেন?

উত্তর : কবি আব্দুল হাকিম দেশীভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা ও ধর্মচর্চা করতে চান। অধিকাংশ মানুষই মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না। আরবি-ফারসিতে ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ ও মহানবীর কথা লেখা আছে। কিন্তু সেগুলো পড়তে পারে না অধিকাংশ মানুষ। তাই সে সব কথা যদি বাংলায় চর্চা করা যায় তবে অন্যায় হয় না। সকল ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি সব ভাষাই বোঝেন। কবির এ বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। তাই তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য কবিতা যেমন লিখতে চান তেমনি বাংলা ভাষাতে ধর্মালোচনাও করতে চান।

প্রশ্ন : যাঁরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন, তাদের কবি কী বলেছেন?

উত্তর : প্রত্যেক মানুষেরই উচিত মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে ভালোবাসা। কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা বাংলা ভাষাকে ভাল না বেসে অবজ্ঞা করে। কবি তাদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বাংলাদেশে বসবাস করে, বাংলার বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে যারা স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে তাদের জন্ম সম্বন্ধে কবি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কবি আরও বলেছেন - এ সমস্ত লোক যেন বাংলাদেশ ছেড়ে অন্যদেশে চলে যায়।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি॥

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম রচিত 'বঙ্গবাণী' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন।

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ভালোবাসা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এদেশে এমন কিছু মানুষ আছে যারা মাতৃভাষাকে ভালবাসে না। মাতৃভাষায় আমরা সহজে বুঝতে পারি। সব ভাষারই স্রষ্টা আল্লাহ। তাই যে ভাষায় যোগাযোগ সহজ সেটিরই চর্চা করা প্রয়োজন। কিন্তু তবুও কিছু লোক বাংলাভাষাকে ঘৃণা করেন। কবি তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন- তাদের জন্ম সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

কবির তীব্র বিদ্রুপ এ সব বিপথগামী মানুষের প্রতি। আব্দুল হাকিম মধ্যযুগের কবি হলেও চিন্তা-চেতনায় তিনি যে অগ্রসর মানুষ সেটি বোঝা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

L-f¡a¡r ec
j¡C-Lm jdpce cš

লেখক পরিচিতি

মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে জুনিয়র সেকশনে ভর্তি হন। এ কলেজে অধ্যয়ন কালেই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তীব্র অনুরাগ জন্মে। ইংরেজিতে কাব্য রচনা করে মহাকবি হবেন এ স্বপ্ন তাঁকে চিরকাল তাড়িত করেছে। প্রথম জীবনে ইংরেজিতে কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য রচনা করেই তিনি যশস্বী হয়ে আছেন। তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার স্পর্শলাভ করে। বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে :
কাব্য : মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
নাঁক : কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়েরোঁ।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ' রচনা করেছেন। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবক ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনা করেন।
১৮৭৩ সালে ২৯শে জুন তিনি পরলোকগমন করেন।

পাঠ পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতা' নামক কাব্য থেকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি সঙ্কলিত। এটি একটি সনেট। এ কবিতায় কবির শৈশবে দেখা কপোতাক্ষ নদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য
এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কপোতাক্ষ নদ কবিতার ভাববস্তু লিখতে পারবেন।
- সনেট সম্পর্কে একটি পরিচিতি লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ- স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা? -যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে

বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

সতত – সর্বদা, সব সময়, **বিরলে** – নিরিবিলি সময়ে, **যেমতি** – যেমন, **নিশার** – রাতের, **কলকলে** – নদীর কলকল আওয়াজে, **বারি** – পানি, **কর** – খাজনা, **বারিরূপ কর** – জল রূপ খাজনা, **মিনতি** – প্রার্থনা, **সখা-রীতে** – বন্ধুর রীতিতে, বন্ধুত্বের নিয়মে, **বঙ্গজ জন** – বঙ্গে জন্মেছেন যিনি, বাঙালি, **বঙ্গের সঙ্গীতে** – বাংলার গানে।

টীকা

সনেট – ইংরেজি সনেট (Sonnet) বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা নামে পরিচিত। সনেট বিশেষ এক ধরনের কবিতা। সনেট ১৪ অক্ষর সমন্বিত ও ১৪ চরণে সীমাবদ্ধ। সনেটের প্রথম আঁ চরণকে বলে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণকে বলে ষটক (Sestet)। অষ্টকে ভাবের সূচনা ও ষটকে ভাবের পরিণতি থাকে। সনেটে একটি ভাবসংগতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

কাহিনী সংক্ষেপ

কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ির পাশ দিয়ে কপোতাক্ষ নদ প্রবাহিত। বিদেশে থেকেও কবির সব সময় মনে পড়ে নদীটির কথা। কপোতাক্ষের বয়ে যাবার কুলকুল ধ্বনি কবির কানে অহরহ বাজে। কবি অনেক দেশে অনেক নদী দেখেছেন। কিন্তু কবির তৃষ্ণা আর কোন নদী মিটাতে পারেনি। জন্মভূমির স্তনে কপোতাক্ষ দুগ্ধ স্রোতের মত।

কবির মনে জিজ্ঞাসা সেই অতি চেনা নদীটির সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা। কবি নদীকে বলেছেন যতদিন সে প্রবহমান থেকে সমুদ্র অভিমুখে ধাবমান হবে ততদিন যেন সে বাঙালির কানে কানে বলে যে একজন বাঙালি কপোতাক্ষের প্রেমরসে মুগ্ধ হয়ে তার নাম বঙ্গের সঙ্গীতে স্মরণ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮২৪ খ. ১৮৪২
   গ. ১৮৯৯ ঘ. ১৯০১

২. কপোতাক্ষ নদ কোন জাতীয় কবিতা?
   ক. শোকগাথা গ. মহাকাব্য
   গ. সনেট ঘ. প্রবন্ধ

৩. সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে কার কথা?
   ক. কপোতাক্ষ নদ খ. মহানন্দা নদী
   গ. সাগরদাঁড়ি গ্রাম ঘ. মাতৃভূমি

৪. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির মূল বিষয় কী?
   ক. আত্মপ্রেম খ. বিদেশপ্রীতি
   গ. স্বজনপ্রীতি ঘ. স্বদেশ প্রীতি

৫. কবির স্নেহের তৃষ্ণা কিসের পানিতে মেটে?
   ক. কপোতাক্ষ নদের খ. যমুনা নদের
   গ. মেঘের পানিতে ঘ. সমুদ্রের পানিতে

৬. 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে' কে?
   ক. করতোয়া নদী খ. জলপ্রবাহ

গ. কপোতাক্ষ নদী ঘ. নদীপ্রবাহ

৭. কবির কান কিসে জুড়ায়?
ক. পাখির কল-কাকলীতে খ. নদীর কলকল শব্দে
গ. মধুর সঙ্গীতে ঘ. মায়ামন্ত্র ধ্বনিতে

খ. এক শব্দে/বাক্যে উত্তর দিন

১. মধুসূদন দত্তের জন্মতারিখ কত?
২. 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য কার রচনা?
৩. 'কৃষ্ণকুমারী' কোন জাতীয় রচনা?
৪. 'কপোতাক্ষ নদ' কি জাতীয় কবিতা?
৫. সনেটের কোন অংশকে অষ্টক বলে?
৬. কবির সব সময় কার কথা মনে পড়ে?
৭. প্রজারূপে সাগরে কর দিতে যায় কে?

ক. উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ক. ১৮২৪ সালে ২. গ সনেট ৩. ক. কপোতাক্ষ নদ
৪. ঘ. স্বদেশপ্রীতি ৫. ক. কপোতাক্ষ নদের ৬. গ. কপোতাক্ষ নদ
৭. খ. নদীর কলকল শব্দে

খ. ১. ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি ২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের
৩. নাঁক ৪. সনেট ৫. প্রথম আঁ লাইনকে
৬. কপোতাক্ষ নদের কথা ৭. কপোতাক্ষ নদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'কপোতাক্ষনদ' কবিতা অবলম্বনে কবির স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিন।
২. সনেট কি? 'কপোতাক্ষনদ' কবিতাটি একটি সনেট? আপনার মন্তব্য লিখুন।
৩. কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে' - কে, কাকে, কেন বলেছে?
২. কবি কপোতাক্ষ নদের কাছে কী মিনতি করেছেন?
৩. 'আর কি হে হবে দেখা' কবি কেন এ প্রশ্ন করেছেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা ..... জন্মভূমি স্তনে।
২. এ প্রবাসে মজি .... বঙ্গের সঙ্গীতে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'কপোতাক্ষনদ' কবিতা অবলম্বনে কবির স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কবি প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর রচিত 'কপোতাক্ষ নদ' সনেটে গভীর স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

কবি যখন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে তখন এ কবিতাটি রচিত হয়েছিল। সুদূর বিদেশে কবির মনে পড়েছে গ্রামের নদীটি। কপোতাক্ষ নদীর তীরে কবির জন্ম। এ নদীর তীরেই তাঁর শৈশব কেটেছে। এ নদীর কথা কবি কোনদিন ভোলেননি। সেজন্যই কবি কপোতাক্ষকে স্মরণ করে বলেছেন-

'সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের টান থাকে শৈশব থেকেই। একটি সংস্কৃতি শ্লোকে বলা হয়েছে 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী' অর্থাৎ জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে গরীয়ান। তাই মানুষ তার জন্মভূমিকে কোনদিন ভোলে না। মধুসূদনও তাই জন্মভূমিকে ভুলতে পারেন নি- ভুলতে পারেননি গ্রামের পাশের সেই নদীপ্রবাহকে। সেজন্যই শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কবি মায়ামন্ত্রের মত নদীর কুলকুল ধ্বনি শুনতে পান। সতত সেই ভ্রান্তির ছলনায় কবি মুগ্ধ হন। বহু দেশে ঘুরে বহু নদ-নদী কবি দেখেছেন। কিন্তু কোন নদী তাকে এত কাছে টানেনি - মুগ্ধ করেনি। স্নেহের তৃষ্ণা আর কোন নদীর জলে কবি মেটাতে পারেনি। মাতা যেমন মাতৃস্নেহে শিশুকে পালন করেন, তেমনি এ নদীও শিশু মধুসূদনকে লালন করেছে। সেজন্য কবির উক্তি-

"দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে"

দ্বিতীয় স্তবকে স্মৃতিকাতর ও দুঃখকাতর মধুসূদন নদীকে প্রশ্ন করেছেন আর দেখা হবে কিনা। তারপরই কবির অনুরোধ। যতদিন কপোতাক্ষ প্রবহমান থাকবে ততদিন যেন বাঙালির কানে কানে বলে বিদেশ-বিভূঁইয়ে বসেও বঙ্গের সঙ্গীতে বঙ্গজ এক কবি নদীকে আকুলভাবে স্মরণ করছে।

উপরের আলোচনায় জানা গেছে কত গভীরভাবে কপোতাক্ষ নদীকে ভালোবেসেছেন ও স্মরণ করেছেন। কপোতাক্ষকে ঘিরেই কবির স্বদেশপ্রেম উচ্চকিত হয়েছে। তাই কপোতাক্ষ সনেটটির মধ্যে দিয়ে কবির প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে - আমরা একথা বলতে পারি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : দুগ্ধ- স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে' কে, কাকে কেন বলেছে?

উত্তর : উদ্ধৃত চরণটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'কপোতাক্ষ নদ' নামক সনেট থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি কবির উক্তি। তিনি নিজ শৈশবের গ্রাম সাগরদাঁড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

শিশু সন্তান মায়ের স্তন পান করে বেঁচে থাকে। মায়ের অমিয় ধারায় যেমন শিশু বাঁচে তেমনি কপোতাক্ষ নদী জন্মভূমিতে প্রবাহিতে মানব শিশুদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

কবির তুলনামূলক উপমা অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে কপোতাক্ষের মহিমা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : কবি কপোতাক্ষ নদের কাছে কী মিনতি করেছেন?

উত্তর : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত। তিনি এই সনেটের ষটক অংশে কপোতাক্ষের কাছে একটি মিনতি জানিয়েছেন। কবি এই কবিতাটি রচনা করেন সুদূর বিদেশে ফ্রান্সের জার্মান ভার্সাই নগরে। তখন কবি নানানভাবে বিপর্যস্ত। সেই দুঃসময়ে স্মৃতিভারাক্রান্ত হৃদয়ে বারবার ভেসে উঠছিল স্বদেশের ছবি নদনদী, গ্রাম শহর কোলাহল ও স্বদেশের মানুষ। এত দূর দেশে থেকেও যে কবি স্বদেশকে ভোলেনি। যতদিন কপোতাক্ষ নদী প্রবাহিত হবে ততদিন যেন সে মধুকবির নাম বাঙালির কানে কানে বলে। এই প্রবাসভূমিতে কবি প্রিয় সখার মত প্রেম-ভাবে মজে প্রিয় কপোতাক্ষ করে স্মরণ করছে - এটি যেন সকল বাঙালির কানে পৌঁছে দেয়।

প্রশ্ন : 'আর কি হে হবে দেখা' কবি কেন এ প্রশ্ন করেছেন?

উত্তর : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যখন এ সনেট কবিতাটি লিখিত হয় তখন কবি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বাস করছিলেন। কবির তখনকার মানসিক অবস্থার কারণেই এ কথা কপোতাক্ষ নদীতে উদ্দেশ্য করে বলেছেন - 'আর কি হে হবে দেখা'।

মধুসূদনের আবাল্যের স্বপ্ন ছিল ইংল্যান্ডে যাওয়া। যে সাধ একদিন সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত কবিকে একসময় ইংল্যান্ডে থেকে ফ্রান্সে পাড়ি দিতে হয়েছিল। ভার্সাই নগরীতে জীবনের এক দুঃখসময় অধ্যায় কে অতিক্রম করার সময় হয়ত স্বদেশ স্বজনের কথা বারবার বেশি করে মনে পড়ছিল কবির। সে সময় তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যেন হয়ত কোনদিন আর দেশে ফেরা হবে না - হয়তো প্রিয় নদীটির সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হবে না। দুঃখে, ক্ষোভে কবি মনের হাহাকার এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ নদ' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি কপোতাক্ষ নদীর প্রশস্তি রচনা করেছেন।
কবি বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন - বহু নদ-নদী দেখেছেন। কিন্তু কপোতাক্ষ নদী কবির শৈশবের নদী। এ নদীর বুকে যেভাবে স্নেহের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন - তা আর কোথাও পাননি। কপোতাক্ষ যেন বুকভরা স্নেহ নিয়ে দুতীরের মানুষকে লালন করেছে। যেমন মা লালন করেন তার শিশুকে। বুকের অমিয় ধারায় সদ্যজাত শিশু বেঁচে থাকে তেমনি দুগ্ধস্রোতরূপ জলপ্রবাহে নদী মানুষকে লালন-পালন করে। এক্ষেত্রে মা ও নদীর কোন পার্থক্য নেই, সেজন্যই কবি নদীকে জন্মভূমিতে প্রবাহিত দুগ্ধস্রোতরূপে কল্পনা করেছেন।
কবি মধুসূদন দত্ত আলোচ্য অংশে শৈশবের নদী কপোতাক্ষকে মহিমান্বিত মাতৃরূপে দর্শন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

h¡wm¡ A¡j¡l
L¡u-L¡h¡c

লেখক পরিচিতি

১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে কায়কোবাদ জন্মগ্রহণ করেন। কায়কোবাদ তাঁর ছদ্মনাম প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়শী। অল্প কিছুকাল কলকাতা মাদ্রাসায় এবং ঢাকায় শিক্ষালাভ করেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার আগে তাঁর শিক্ষা জীবন শেষ হয়। তিনি ডাক বিভাগে পোস্টমাস্টারের চাকরি গ্রহণ করেন। ঐ চাকুরিতে নিজের গ্রামেই তিনি আজীবন অবস্থান করেন।

১৯৫১ সালে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কায়কোবাদ বেশ কয়েকটি মহাকাব্য লিখেছেন এবং গীতিকবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রধান মহাকাব্যগুলো হচ্ছে- মহাশ্মশান, শ্মশান ভস্ম, মহররম শরিফ ইত্যাদি। অশ্রুমালা তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কায়কোবাদের কবিতায় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ পরিচিতি

'বাংলা আমার' কবিতাটি কায়কোবাদের 'অমিয়ধারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। এ কবিতায় জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোবাসার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলা আমার আমি বাংলার
বাংলা আমার জন্মভূমি
গঙ্গা ও যমুনা পদ্মা ও মেঘনা
বহিছে যাহার চরণ চুমি!

বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল
এত সুখ-শান্তি এত পরিমল
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া।

হৃদয় আমার বাংলার লাগি
যে দেশেই থাকি সদা থাকে জাগি
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার

বাংলা আমার অমিয়-ধারা।

বাংলার তরু বাংলার ফল
বাংলার পুষ্প বাংলার কমল
মাঠে ঘাটে পথে তটিনী সৈকতে
যে দেখে সে আপন হারা।

বাংলার নদী কি শোভাশালিনী
কি মধুর তার কুলু কুলু ধ্বনি
দুধারে তাহার বিটপীর শ্রেণী
হেরিলে জুড়ায় হিয়া।

শব্দার্থ

চুমি - চুম্বন করে, **অমিয়** - সুধা, অমৃত।

কাহিনী সংক্ষেপ

'বাংলা আমাদের জন্মভূমি, 'গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা-মেঘনা এদেশ দিয়ে প্রবাহিত। বাংলা আমার হৃদয়কে শীতল করে। এত সুখ শান্তি, এত গাছ, ফল-ফুল আমাদের হৃদয়কে মোহিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'বাংলা আমার' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?
   ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নজরুল ইসলাম
   গ. কায়কোবাদ ঘ. আহসান হাবীব
২. 'হৃদয় আমার করে সুশীতল' কে করে?
   ক. বাংলার জল খ. বাংলার ফল
   গ. বাংলার নদী ঘ. বাংলার ফুল
৩. কি দেখে কবির হৃদয় জুড়ায়?
   ক. নারকেল বীথি খ. বিটপীর শ্রেণী
   গ. আম্রকুঞ্জ ঘ. তমালবৃক্ষ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. কায়কোবাদ ২. ক. বাংলার জল ৩. খ. বিটপীর শ্রেণী

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- জন্মভূমির প্রতি কবির অনুরাগের আরও পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলার কুলি বাংলার চাষি,
বাংলার মাটি কত ভালোবাসি
প্রাণের আবেগে যাই সদা ছুটি
যেখানে বাঙালি আছে।

বাংলার গল্প বাংলার গীত
শুনিলে এ চিত্ত সদা বিমোহিত
সুখ দুঃখ সব নিরালা বসিয়া
বলি বাঙালির কাছে।

বাংলার কাব্য বাংলার ভাষা
মিটায় আমার প্রাণের পিপাসা
সে দেশ আমার নয় গো আপন
যে দেশে বাঙালি নাই।

বাঙালির সনে মিশে প্রাণে প্রাণে
থাকিব সতত জীবনে মরণে
বাঙালি আমার আপনার জন
বাঙালি আমার ভাই!

সুখে দুঃখে যারা এসে মোর পাশে
তোষে সদা মোরে মধুর সম্ভাষে
আমিও বাঙালি তারাও বাঙালি
বাংলা আমার জন্মভূমি!

গোধূলি লগনে জগদীশে স্মরে
বিদায় লইব জনমের তরে
লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে
বাংলার মায়ের ক্রোড়ে।

কাহিনী সংক্ষেপ

চাষি-মজুর-কুলি সবাইকে কবি ভালোবাসেন। বাংলার কাব্য, গীত আমাদের চিত্তকে মোহিত করে। বাঙালি মাত্রই আমার আপনজন। জীবনশেষে এদেশের মাটির কোলেই আশ্রয় নেব।

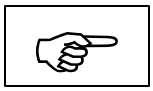

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. 'কাকে কবি ভাই বলেছেন?
   ক. প্রতিবেশীকে খ. বাঙালিকে
   গ. সহপাঠীকে ঘ. গ্রামবাসীকে

২. সন্ধ্যার আঁধারে কবি কোথায় লুকাতে চেয়েছেন?
   ক. পল্লী মায়ের ক্রোড়ে খ. নিজের কুটীরে
   গ. বাংলা মায়ের ক্রোড়ে ঘ. আশ্রমে

৩. "সে দেশ আমার নয় গো আপন" পরের লাইনটি কী?
   ক. যে দেশে মানুষ নাই খ. যে দেশে বন্ধু নাই
   গ. যে দেশে বাঙালি নাই ঘ. যে দেশে সখা নাই

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. বাঙালিকে ২. গ. বাংলা মায়ের ক্রোড়ে ৩. গ. যে দেশে বাঙালি নাই

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'বাংলা আমার' কবিতা অবলম্বনে কবির জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দিন।
২. 'বাংলা আমার' কবিতার মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কবি তাঁর জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন?
২. বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি কবিকে আকৃষ্ট করে কেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার
   বাংলা আমার অমিয়-ধারা।
২. বাঙালি আমার আপনার জন
   বাঙালি আমার ভাই!

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : বাংলা আমার কবিতা অবলম্বনে কবির জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দিন।

উত্তর : জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কবিও তাঁর স্বদেশকে ভালোবেসেছেন। আলোচ্য কবিতা 'বাংলা আমার' কবিতায় জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। জন্মভূমির গাছ-পালা প্রকৃতি, মানুষ সবই কবির কাছে সমান প্রিয়। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত কবির ভালোবাসা। তাই জন্মভূমির সবকিছুকেই কবি দেখেন ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে।

'বাংলা আমার' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসার পরিচয় ফুটে উঠেছে। গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা,-মেঘনা এদেশকে জড়িয়ে আছে। বাংলার আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি সবকিছু কবির কাছে মোহনীয় মনে হয়। পদ্ম আর শাপলা কবির মনকে স্বপ্নের বিভোর করে তোলে।

কত না এদেশের মানুষ। এদের সবার পরিচিতি তারা বাঙালি। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে কবি বাঙালি বলে ভালবাসেন। প্রতিটি বাঙালি তার আপনজন- আত্মার আত্মীয়। এদেশের আকাশ-বাতাস ভরপুর গানে-সঙ্গীতে। কবির মনের গহীনে এর কত না মাধুর্য ছড়িয়ে যায়। বাংলার মানুষের মত বাংলার সংস্কৃতিকেও কবি ভালবাসেন। বাংলা ভাষা, বাংলার কাব্য কবির তৃষিত অন্তরকে তৃপ্ত করে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের শেষ লগ্ন আসে। অবধারিতভাবে কবির ক্ষেত্রেও জীবনের প্রদীপ একদিন নিভে যাবে। কবি সেদিন বাংলাদেশের শ্যামল মাটিতে চিরতরে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

বাংলা সাহিত্যে অনেক কবির কবিতাতেই স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে কায়কোবাদও ব্যতিক্রম নন। তবে তাঁর কবিতার ভাষা যেমন সহজ-সরল তেমনি স্বদেশপ্রেমের তাঁর সহজ-সরল অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্বদেশেপ্রেমের অকৃত্রিম প্রকাশ পাঠকের চিত্তকে সহজে আলোড়িত করে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : কবি তাঁর জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন?

উত্তর : মানুষের সাধারণ বিশ্বাসমতে স্বর্গ সুখের স্থান। কিন্তু কবি জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান বলে মনে করেছেন। জন্মভূমির প্রতি সকলের ভালোবাসা ও প্রেম থাকে। কবির ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এ দেশের সুবজ-শ্যামল প্রান্তর, নদ, নদী, পশু, পাখি সবাই কবির কাছে প্রিয়। এদেশের মানুষ তাঁর আত্মার আত্মীয়। এদেশের কবিতা কাব্য, গান-ভাষা সবই কবির একান্ত কাম্য। এমন সুখ-শান্তি আর কোথাও নেই। তাই কবি বলেছেন - স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার/বাংলা আমার অমিয় ধারা।

কবি কায়কোবাদ একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তাই স্বদেশকেই তিনি স্বর্গ মনে করেছেন এবং স্বদেশেই স্বর্গের শান্তি অনুভব করেছেন।

ব্যাখ্যা উত্তর

২. বাঙালি আমার আপনার জন/বাঙালি আমার ভাই।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি কায়কোবাদের 'বাংলা আমার' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবির গভীর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

কবি 'বাংলা আমার' কবিতায় এদেশের নদ-নদী, শস্য-শ্যামল প্রান্ত, পশু-পাখি ও প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এদেশের মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধও ফুটে উঠেছে। বাঙালি মাত্রই সকলকে কবি ভালোবেসেছেন। বাংলার ভূখণ্ডে বসবাসকারী, বাংলা ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা সকলেই বাঙালি। কবি বাঙালি মাত্রকেই আপন ভাই বলে গ্রহণ করেছেন। তাই কবি বলেছেন-বাঙালি আমার ভাই।

উদ্ধৃত অংশে বাঙালির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

hr

Ihª¼ce¡b W¡LI

লেখক পরিচিতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **১৮৬১** খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে, বাংলা **১২৬৮** সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতার নাম সারদাদেবী। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেকালের একজন কর্মসফল ও বিখ্যাত ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি দূর এগোয়নি। অল্পবয়সেই তাঁর কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এমন কোন শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। **১৯১৩** সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বলা চলে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রচেষ্টাতেই ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষা বাংলাকে আন্তর্জাতিক দরবারে পৌঁছে দেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম- **কবিতা :** মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পুনশ্চ ইত্যাদি। **ছোঁ গল্প :** 'গল্পগুচ্ছ' (চারখণ্ড), 'গল্পসল্প', 'সে'। **উপন্যাস :** 'চোখের বালি, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি। **নাঁক :** বিসর্জন, রাজা ও রাণী, রক্ত করবী, ডাকঘর। **আত্ম জীবনী :** 'জীবন স্মৃতি' ছেলেবেলা।
১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, বাংলা **১৩৪৮** সালের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

পাঠ পরিচিতি

'বৃক্ষ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনবানী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ কবিতাটি কবির 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতার অংশ বিশেষ। পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করার পিছনে বৃক্ষের ভূমিকাকে কবি স্মরণ করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বর্ষণমুখর পল্লী প্রকৃতির একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-' পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

* * *

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধচলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে

শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।
বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন,
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে-গানে চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণেবর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ভূমিগর্ভ – মাটির ভিতর, **নিঃসাড়** – সাড়াহীন, **শৈল** – পাহাড়, **পল্লব** – কচি পাতা, **পন্থা** – পথ, **বাণীশূন্য** – কথাহীন, নির্বাক, **ইন্দ্রধনু** – রংধনু, **বসুন্ধরা** – পৃথিবী।

আলোকের প্রথম বন্দনা – আলোর প্রথম আরাধনা। অন্ধকার ভূমিগর্ভ থেকে বৃক্ষই প্রথম সূর্য বা আলোর কামনা করেছিল। বৃক্ষ হচ্ছে পৃথিবীর আদি প্রাণ। বৃক্ষের মধ্য দিয়েই প্রথম জীবনের প্রাণ স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছিল। বৃক্ষের বেঁচে থাকার শক্তি আসে সূর্যের আলো থেকে। তাই বলা হয়েছে বৃক্ষই আলোর প্রথম বন্দনা বা আরাধনা করেছে।

মৃত্তিকার বীর সন্তান –বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীর সন্তান বলা হয়েছে। মৃত্তিকা বা মাটির ভিতর থেকে বৃক্ষের আগমন। এ বৃক্ষই মরুময়, পাথুরে পৃথিবীকে শ্যামল শোভাময় করেছে। সেজন্য বৃক্ষ মাটিমাতার বীর সন্তান বলা হয়েছে।

আলোকের গুপ্তধন – বৃক্ষ বেঁচে থাকার জন্য আলো কামনা করেছে। আলোর বর্ণবৈভব ও আলোর গুপ্তধনকে প্রকাশ করেছে। আলো বিচিত্র বর্ণের উৎস। এই আলোক শোষণ করেই বৃক্ষ তাঁর পত্র পুষ্পকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করেছে।

কাহিনী সংক্ষেপ

অন্ধকার ভূমিগর্ভ থেকে আলোকের আহ্বানে বৃক্ষের উত্থান। বৃক্ষ পৃথিবীর আদি প্রাণ। ঊর্ধ্বলোকে মাথা উঁচু করে বৃক্ষ আলোকের প্রথম বন্দনা করেছে। মরুময় ও পাথুরে পৃথিবী বৃক্ষের আবির্ভাবেই সবুজ ও শ্যামল হয়েছে।

পৃথিবী একদিন ছিল উৎসবময়। বৃক্ষের শাখায় শাখায় চঞ্চল বায়ুপ্রবাহে সুরের ও সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের আলোক শোষণ করে বৃক্ষ নিজের পত্র-পুষ্পকে বর্ণ ও রঙে বর্ণিল করেছে। বৃক্ষ পৃথিবীকে যৌবনের অমৃতরসে অপরূপ ও চিরযৌবনা করে সৃষ্টি করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'বৃক্ষ' কবিতাটির কবি কে?
   ক. রজনীকান্ত সেন খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
   গ. বিহারীলাল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. 'বৃক্ষ' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে?
   ক. গীতাঞ্জলি খ. বনবাণী
   গ. রূপসীবাংলা ঘ. সারদামঙ্গল

৩. কবি কাকে আদি প্রাণ বলেছেন?
   ক. লতাকে খ. বৃক্ষকে
   গ. এককোষী প্রাণীকে ঘ. সবুজ শ্যামলাকে

৪. মৃত্তিকার বীর সন্তান কে?
   ক. বৃক্ষ খ. সিংহ
   গ. ব্যাঘ্র ঘ. মানুষ

৫. কবি কাকে সঙ্গীতের আদিম আশ্রয় বলেছেন?
   ক. বৃক্ষ শাখা খ. পত্রপুষ্প
   গ. দেহকাণ্ড ঘ. পল্লব

খ. সত্য হলে স মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. 'বৃক্ষ' কবিতায় বৃক্ষের বন্দনা করা হয়েছে।
২. 'বৃক্ষ' কবিতাটি সোনার তরী কাব্য থেকে গৃহীত।
৩. বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীর সন্তান বলা হয়েছে।
৪. মরু প্রান্তরে আদিম সঙ্গীতের সৃষ্টি।
৫. বৃক্ষ পৃথিবীকে অনন্ত যৌবনা করে সাজিয়েছে।

গ. এক কথায়/বাক্যে উত্তর দিন

১. অন্ধ ভূমিগর্ভ থেকে সূর্যের আহ্বান কে শুনে ছিল?
২. মৃত্তিকাকে মুক্তি দিয়েছে কে?
৩. কী একদিন বাণীশূন্য ছিল?
৪. কোথায় আদিম সঙ্গীত রচিত হয়েছিল।
৫. বৃক্ষ প্রাণশক্তি পেল কোথা থেকে?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. খ. বনবাণী ৩. খ. বৃক্ষকে ৪. ক. বৃক্ষ ৫. ক. বৃক্ষশাখা
খ. ১. স ২. মি ৩. স ৪. মি ৫. স
গ. ১. বৃক্ষ ২. বৃক্ষ ৩. জল-স্থল ৪. বৃক্ষ শাখায় ৫. সূর্যের আলোক থেকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক

১. পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান কী বুঝিয়ে লিখুন।
২. বৃক্ষ কবিতাটির মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কবি বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীরসন্তান বলেছেন কেন?
২. পৃথিবীকে সবুজ-শ্যামল করেছে কে?
৩. কবি কাকে সঙ্গীতের আদিম আশ্রয় বলেছেন? কেন?
৪. আলোকের গুপ্তধন বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুন দুর্গ হতে

২. শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়।

৩. আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্ত যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান কী বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতার অংশ বিশেষ আমাদের আলোচ্য কবিতা। অংশ বিশেষের 'বৃক্ষ' নামটি সঙ্কলকদের দেওয়া। কবিতার এ অংশটিতে বৃক্ষের অবদানের কথা বিধৃত হয়েছে।

প্রাণের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী ছিল মরুময় ও শৈল শিখরে আবৃত। সূর্যের আলোকে প্রথম ঘুম ভাঙল মৃত্তিকার গর্ভে সুপ্ত বৃক্ষের। বৃক্ষই পৃথিবীর আদি প্রাণ। সূর্য রশ্মির প্রাণশক্তি পানের জন্য ঊর্ধ্বমুখী বৃক্ষের জন্ম সূচনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ছন্দহীন পাষাণের হৃদয়ে সৃষ্টির বেদনার প্রথম সঞ্চার। মৃত্তিকার এ বীর সন্তান ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মরুর দুর্গ থেকে পাহাড়ের কঠিন প্রস্তরে। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে সর্বত্র সবুজের বিজয় অভিযান চলল। বৃক্ষরাজিতে পৃথিবী হয়ে উঠল শ্যামল।

পৃথিবী ছিল এতদিন বাণীহীন। বৃক্ষের শাখায় চঞ্চল বায়ুর গতিতে সৃষ্টি হল সুরের বৈচিত্র্য। শুরু হল ঋতুর উৎসব। সূর্যের আলোক আকণ্ঠ পান করে আলোকের বহু বর্ণিল রূপ প্রকাশিত হল বৃক্ষের পল্লবে-পুষ্পে। আকাশ থেকে নেমে এল যৌবন-অমৃতরস স্বরূপ বৃষ্টি। বৃক্ষ পত্রপুষ্পপুটে তা গ্রহণ করে পৃথিবীকে অনন্ত যৌবনা করে তুলল।

আমরা যে পরিচিত পৃথিবীতে বাস করছি তা নির্মাণ করেছে বৃক্ষ। বৃক্ষ না থাকলে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হত না। পৃথিবী হত রুক্ষ মরুময় এক গ্রহ- যেখানে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। তাই যথার্থ অর্থেই বলা যায় বৃক্ষ আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : কবি বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীর সন্তান বলেছেন কেন?

উত্তর : কবি বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীর সন্তান বলেছেন। এর প্রথম কারণ বৃক্ষ মৃত্তিকা বা মাটি থেকে উদ্ভূত হয়। দ্বিতীয় কারণ এ বৃক্ষই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে। আদিমকালে পৃথিবী ছিল মরুময় রুক্ষ প্রান্তর। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয়েছে বৃক্ষকে অবলম্বন করে। সূর্যের আলোকস্পর্শে মাটির গর্ভ থেকে বৃক্ষের উত্থান। এ বৃক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। পৃথিবীকে করেছে সবুজ ও শ্যামল। বৃক্ষের পত্র-পুষ্পে পৃথিবী হয়েছে রূপবতী। তাই বৃক্ষকে কবি বলেছেন মৃত্তিকার বীর সন্তান বা সাহসী সন্তান।

প্রশ্ন : কবি কাকে সঙ্গীতের আদিম আশ্রয় বলেছেন? কেন?

উত্তর : কবি বৃক্ষকে সঙ্গীতের আদিম আশ্রয় বলেছেন। আদিম কালে পৃথিবী ছিল মরুময়, রুক্ষ ও প্রাণহীন। বৃক্ষ দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রা। এ বৃক্ষের শাখায় চঞ্চল বায়ুর অভিঘাতে সঙ্গীতের সৃষ্টি। বৃক্ষের শাখাকে কবি তাই সঙ্গীতের আদিম আশ্রয় বলেছেন।

প্রশ্ন : আলোকের গুপ্তধন বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : বৃক্ষ সূর্যের আলো থেকেই প্রাণ শক্তি পায়। পৃথিবীকে সবুজ শ্যামল করেছে বৃক্ষ। এ বৃক্ষই পল্লব-পুষ্পে নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে পৃথিবীর শোভা বাড়ায়। এই নানা রঙের মেলা বৃক্ষ সৃষ্টি করে সূর্যের আলোক পান করেই। গুপ্তধনের মত সূর্যের আলোতে লুকিয়ে থাকে বর্ণের নানা সমাহার। বৃক্ষ রঙ এর ঐশ্বর্য পায় আলোক থেকেই। তাই বৃক্ষকে আলোকের গুপ্তধন বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে।

উদ্ধৃত অংশটি কবি রবীন্দ্রনাথের 'বৃক্ষ' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে বৃক্ষের জয়গান ঘোষণা করা হয়েছে। আদিকালের পৃথিবী ছিল মরুময় ও রুক্ষ। যেদিন সেখানে বৃক্ষের প্রাণের বিকাশ হল সেদিনই পৃথিবীতে পরিবর্তনের শুরু। মাটি উদ্ভুত বলেই কবি বৃক্ষকে বলেছেন মাটির বীর সন্তান। দ্বিতীয়ত বৃক্ষই মাটিকে দিয়েছে মহিমা। মরুর দুর্গ দুয়ার ভেঙে পৃথিবীকে সবুজ-শ্যামল ও সজল করার সংগ্রাম শুরু করেছিল বৃক্ষ। তাই আজ পৃথিবী গাছে-লতায়-পাতায় দৃষ্টি মনোহর। কবি যথার্থভাবেই কবিতার এ অংশে বৃক্ষের জয় মহিমা ঘোষণা করেছেন।

আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্ত যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা

উদ্ধৃত অংশটি কবি রবীন্দ্রনাথের ' বৃক্ষ' নামক কবিতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে বৃক্ষের অবদানের কথা বলা হয়েছে।
আদিকালে পৃথিবী ছিল উষর মরুভূমি। সেখানে যেদিন প্রাণের বিকাশ হল সেদিন থেকেই পৃথিবীর পরিবর্তনের সূত্রপাত। পৃথিবীর আদিম প্রাণ বৃক্ষ। সূর্যের আলোক পান করে বৃক্ষের উদ্ভব। সমস্ত পৃথিবী সবুজ-শ্যামল করেছে বৃক্ষ। বৃক্ষের কারণে জলজ কণা আকাশ থেকে নেমে এল বৃষ্টি হয়ে। বৃক্ষ তার পত্র-পুষ্প পুটে বৃষ্টি অমৃত ধারাকে গ্রহণ করে পৃথিবীকে করে তুলল সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত। বসুন্ধরা হল অনন্ত যৌবনা।
বৃক্ষ পৃথিবীকে কিভাবে সৌন্দর্য, সুষমা ও শোভায় মণ্ডিত করেছে সেটি বর্ণনা করাই কবির উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

S£he ¢h¢eju

গোলাম মোস্তফা

লেখক পরিচিতি

গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ সালে যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ ও পরে বি.টি পাস করেন। কর্মজীবনে স্কুলে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন। এই সূত্রে দীর্ঘকাল বিভিন্ন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫০ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রক্তরাগ (১৯২৪), হাস্নাহেনা (১৯৩৪), খোশরোজ (১৯২৯), বুলবুলিস্থান (১৯৪৯) প্রধান। বিশ্বনবী (১৯৪২) জীবন বিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

১৯৬৪ সালে গোলাম মোস্তফা মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'জীবন বিনিময়' কবিতাটি গোলাম মোস্তফা 'বুলবুলিস্থান' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি কাহিনীমূলক। দিল্লীর প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের জীবনের বিনিময়ে পুত্র হুমায়ুনের রোগমুক্তি কাহিনীর মূল বিষয়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- পুত্র হুমায়ুনের চিকিৎসার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উৎকণ্ঠিত পিতা বাবরের উৎকণ্ঠার একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর-
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।

রাজ্যের যত বিজ্ঞ হেকিম কবিরাজ দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

তবু তাঁর সেই দুরন্ত রোগ হটিতেছে নাকো হায়,
যত দিন যায়, দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়।

শুধাল বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি,
'বল বল আজি সত্যি করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি,
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে নাকি?'

নতমস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোনো কথা,
মুখর হইয়া উঠিল তাঁদের সে নিষ্ঠুর নীরবতা
শেলসম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!

হেনকালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন-'সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ।

শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিকো মানি-
'তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানি,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে ধন জানি তাহা আমি জানি।'

কাহিনী সংক্ষেপ

দিল্লীর সম্রাট বাবরের চোখে ঘুম নেই। তাঁর পুত্র হুমায়ুন রোগে শয্যাশায়ী। মৃত্যু নিরবে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। চিকিৎসকবৃন্দ ব্যর্থ। এমন সময় এক দরবেশ বললেন- তোমার সবচেয়ে যা প্রিয় তা উৎসর্গ করতে পারলে হুমায়ুন বেঁচে যাবে। বাবর বললেন - আমার সবচেয়ে কি প্রিয় তা আমি জানি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি কে রচনা করেন?
   ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত　　খ. কাজী নজরুল ইসলাম
   গ. গোলাম মোস্তফা　　ঘ. আহসান হাবীব

২. কোনটি গোলাম মোস্তফা রচিত কাব্য?
   ক. ভাঙা তলোয়ার　　খ. রক্তরাগ
   গ. উত্তর বসন্ত　　ঘ. শোক সঙ্গীত

৩. মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধন কি?
   ক. নিজের জীবন　　খ. পুত্রের জীবন
   গ. ধন সম্পদ　　ঘ. ক্ষমতা

৪. শেলসম আসি বাবরের বুকে ---- শূন্য স্থানে কি বসবে?
   ক. বিঁধিল কাঁটার ব্যথা　　খ. বিঁধিল মনের ব্যথা
   গ. বিঁধিল দারুণ ব্যথা　　ঘ. বিঁধিল কিসের ব্যথা

৫. 'ভিষক' শব্দের অর্থ কোনটি?
   ক. ভিস্তিওয়ালা　　খ. পানি বাহক
   গ. চিকিৎসক　　ঘ. মধু বিক্রেতা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. গ. গোলাম মোস্তফা　　২. খ. রক্তরাগ　　৩. ক. নিজের জীবন
৪. ঘ. বিঁধিল কিসের ব্যথা　　৫. গ. চিকিৎসক

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বিধাতার নিকট বাবরের প্রার্থনার একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- পিতৃস্নেহের জয়ের কাহিনীটি লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনারত হাতদুটি তাঁর, নয়নে অশ্রুজল।

কহিল কাঁদিয়া- 'হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু, পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।'

স্তব্ধ-নীরব গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী,
গভীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্বরাণী,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কী কানাকানি।

সহসা বাবর ফুকারি উঠিল-'নাহি ভয় নাহি ভয়,
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আল্লাহ যে দয়াময়,
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে-মরিবে না নিশ্চয়।'

ঘুরিতে লাগিল পুলকে বাবর পুত্রের চারিপাশ
নিরাশ হৃদয় সে যেন আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস,
তিমির রাতের তোরণে তোরণে ঊষার পূর্বাভাস।

সেইদিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের,
হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের,
নতুন জীবনে হুমায়ুন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ফের।
মরিল বাবর-না, না ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?
মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোন ক্ষয়,
পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়!

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ফুকারি – চিৎকার করে, **কবুল** – স্বীকার, **ভিষকবৃন্দ**- কৃষকগণ, **নিদ**- ঘুম, **দৃপ্ত**- উদ্ধত।

কাহিনী সংক্ষেপ

দরবেশের কথা শুনে বাবর গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। বাবর জানতেন নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। তিনি বিধাতার কাছে নিজের জীবন সমর্পণ করে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। পিতৃস্নেহের কাছে মৃত্যুর এভাবেই পরাজয় ঘটল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. পিতৃ স্নেহের কাছে কি পরাজিত হয়েছে?
   ক. জীবন খ. মরণ
   গ. রোগ ঘ. শোক

২. বাবর বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে কি চাইলেন?
   ক. নিজের প্রাণ খ. অঢেল সম্পদ
   গ. সাম্রাজ্য ঘ. পুত্রের প্রাণ

৩. মরে কে অমর হয়েছে?
   ক. বাবর খ. হুমায়ুন
   গ. ভিষকবৃন্দ ঘ. অনুচরবৃন্দ

৪. পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে - শূন্যস্থানে কি হবে?
   ক. পুত্রের পরাজয় খ. মমতার পরাজয়
   গ. মৃত্যুর পরাজয় ঘ. মরণের পরাজয়

৫. 'তিমির রাতের তোরণে তোরণে ঊষার পূর্বাভাস' চরণটিতে উষার পূর্বাভাস বলতে কি বোঝান হয়েছে?
   ক. সূর্যের উদয় খ. সকালের গুঞ্জন
   গ. রোগমুক্তির লক্ষণ ঘ. অভয়বাণী

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. মরণ ২. ঘ. পুত্রের প্রাণ ৩. ক. বাবর
৪. ঘ. মরণের পরাজয় ৫. গ. রোগমুক্তির লক্ষণ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'জীবন বিনিময়' কবিতায় পিতৃস্নেহের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।
২. 'জীবন বিনিময়' কবিতার কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন কী? বাবর কেন তা উৎসর্গ করলেন?
২. প্রার্থনা মোর কবুল করেছে' কী প্রসঙ্গে কার প্রার্থনার কথা এখানে বলা হয়েছে?

গ. ব্যাখ্যা

১. তিমির রাতের তোরণে ঊষার পূর্বাভাস
২. পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : জীবন বিনিময় কবিতায় পিতৃস্নেহের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

উত্তর : 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কবি গোলাম মোস্তফা একটি মর্মস্পর্শী জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা যে মৃত্যুঞ্জয়ী তারই চিত্রণ হয়েছে এ কবিতায়। এ জন্যই কবিতাটি পাঠকের অতিপ্রিয়।

কোন মানুষই মৃত্যু চায় না। তার কারণ মানুষ মাত্রই নিজের জীবনকে ভালবাসে। জীবনে যত ব্যর্থতা ও অপূর্ণতাই থাক না কেন তবু নিজের জীবনকে মানুষ ভালবাসে। তাই বলা যায় জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন।

অথচ এই শ্রেষ্ঠধনকে সম্রাঁ বাবর উৎসর্গ করলেন। তাঁর প্রিয় সন্তান, যুবরাজ হুমায়ুন রোগশয্যায় শায়িত। দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। রোগমুক্তির কোন লক্ষণ নেই। সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হুমায়ুন। পিতার মন হুহু করে কেঁদে উঠছে। একজন দরবেশ বললেন বাবর যদি তার শ্রেষ্ঠধনকে উৎসর্গ করতে পারে তবেই হুমায়ুন বেঁচে যাবে। বাবর বুঝতে পারলেন দরবেশের কথার মর্মবাণী। তিনি ধ্যানে বসে বিধাতার কাছে আকুল প্রার্থনা করলেন। নিজের যে জীবন সব চাইতে শ্রেষ্ঠধন তাই হুমায়ুনের রোগমুক্তির বিনিময়ে দান করলেন। পিতার মনের আকুল আবেদন বিধাতার কাছে পৌঁছাল। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। আনন্দে নেচে উঠলেন বাবর। সেইদিন থেকে বাবরের রোগ চিহ্ন দেখা গেল এবং হুমায়ুন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। এভাবেই নিজের জীবন দিয়ে বাবর রক্ষা করলেন হুমায়ুনের জীবন। পিতৃস্নেহের কাছে মৃত্যু পরাজিত হল। আর পিতৃস্নেহের গৌরবে বাবর মৃত্যু বরণ করে চিরকাল চিরঞ্জীব হয়ে থাকলেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন কি? বাবর কেন তা উৎসর্গ করলেন?

উত্তর : মানুষের শ্রেষ্ঠধন তার জীবন। মানুষ তার জীবনকে সবচেয়ে ভালবাসে। একটিবার মাত্র মানুষ জীবন লাভ করে। তারপর জীবনের আয়ুও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মানব জীবনে বহু হতাশা ও ব্যর্থতা আছে। তবুও এ জীবনই মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠধন।

মোগল সম্রাঁ বাবর তাঁর প্রিয় জীবনকে উৎসর্গ করলেন। পিতৃস্নেহের কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। পিতৃস্নেহের কাছে মৃত্যুর পরাজয় হল।

ব্যাখ্যা

২. পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'জীবন বিনিময়' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে পিতৃস্নেহের গৌরবের কথা বলা হয়েছে।

মানুষ মরতে চায় না - মানুষ বাঁচতে চায়। বাবরের ক্ষেত্রে ঘটনাটি হল উল্টো। বাবরই মরণকে ডেকে আনলেন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। প্রিয়পুত্র হুমায়ুনের রোগমুক্তির জন্য বাবর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই উৎসর্গের কারণ পিতৃস্নেহ। পিতৃস্নেহের কারণেই নিজের জীবনে যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাই বাবর দান করলেন।

মরণ বাবরকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে পিতৃস্নেহের গৌরব এতটুকু ম্লান হয়নি বরং পিতৃস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

উমর ফারুক

L¡St eSl¦m Cpm¡j

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোঁ বেলাতেই লেটোর দলে গান ও নাঁক রচনা শুরু করেন। লেখাপড়া বেশি দূর এগোয়নি প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে। ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এ সময় থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নজরুল ইসলাম সাহিত্যচর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী নামে পরিচিত। বিদেশী শাসক, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার কবিতায় - সেজন্য নজরুল বিদ্রোহী কবি। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

নজরুল ইসলামের বিশিষ্ট কয়েকটি রচনা-

কাব্যগ্রন্থ - অগ্নিবীণা (১৯২২), ছায়ানট (১৯২৩), ভাঙার গান (১৯২৪), বিষের বাঁশী, প্রলয় শিখা, চক্রবাক ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ : ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)।

প্রবন্ধ : যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী।

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট কবি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাঠ পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' কবিতাটি কবির 'জিঞ্জীর' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এখানে কবি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের জীবন ও গুণাবলীর চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'উমর ফারুক' কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম মহৎ সৃষ্টি।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- আযানের আহ্বান সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হযরত উমরকে কবি কেন ফিরে আসতে বলেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- উমরের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

তিমির রাত্রি- এশার আযান শুনি দূর মসজিদে।
প্রিয়হারা কার কান্নার মত এ বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির উল্ মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন!
তকবির শুনি, শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই-উঠিয়াছে কিরে গগনে মরুর শশী?
ও আযান, ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান?
আবার লুটায়ে পড়ি।
'সে দিন গিয়াছে'- শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।
উমর! ফারুক! আখেরি নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহবান নয়-রূপ ধরে এস -গ্রাসে অন্ধতা-রাহু!
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ।

শুধু অঙ্গুলি হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে শমশের
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি
আর একবার লোহিত সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
ইসলাম-সে তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি - কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর
'মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর।'

* * *

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নিক' নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা-পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে।
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

তিমির – অন্ধকার, **আমির উল মুমেনিন** – বিশ্বাসীদের নেতা, **মুয়াজ্জিন** – যিনি আযান দেন।
তকবির – মহিমা ঘোষণা করা, **বাতায়ন** – জানালা, **মরু** – মরুভূমি, **শশী** – চাঁদ, **আখেরী** – শেষ, **রাহু** – অপদেবতা
জ্যোতি – আলো, **শমশের** – তরবারী, **লোহিত সাগর** – এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী একটি সাগর।
ফিরদৌস – একটি বেহেশতের নাম, **ধুলার তখত** – ধুলার সিংহাসন। উমর বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। কিন্তু মহামূল্যবান রত্নখচিত কোন সিংহাসনে না বসে মাটিতে খেজুর পাতা বিছিয়ে বসে রাহুকাঁ পরিচালনা করতেন।
সাইমুম – মরুভূমির ঝড়,
তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানেনা মুয়াজ্জিন - আযানের ধ্বনির সঙ্গে হযরত উমরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ইসলামের প্রথম যুগে কোরেশদের নির্যাতনের ভয়ে নামায পড়ার জন্য প্রকাশ্যে আযান দেওয়া সম্ভব হত না। হযরত উমর ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে নির্যাতনের ভয় অনেকটা কমে যায়। তখন থেকেই মুসলমানগণ প্রকাশ্যে আযান দিতে থাকেন।

উমর ফারুক - উমর ফারুক (রা) খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর শাসনকাল দশ বছর (৬৩৪ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) হযরত উমর একজন সফল শাসক ছিলেন। একজন গণতান্ত্রিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অমর হয়ে আছে। ফারুক শব্দটি উপাধি। এর অর্থ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী।

দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে শমশের - হযরত উমর (রা) কোরায়েশদের মত পৌত্তলিক এবং ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি একদিন হযরত মুহম্মদকে (সঃ) হত্যা করার জন্য বের হন। পথিমধ্যে শুনতে পান যে তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উমর (রা) বোনের বাড়িতে ছুটে যান ও নির্মমভাবে ভগ্নিপতিকে প্রহার করেন। স্বামীকে বাঁচাতে যেয়ে বোনও আহত হন। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও কেউই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেন না। তখন উমর জানতে চাইলেন বাড়িতে উমর প্রবেশ করার আগে তাঁরা কি পড়ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী কোরআনের বাণীটি উমরের হাতে দিলেন। সেটি ছিল সুরা তোয়াহা। সেটি পড়ে উমর মুগ্ধ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মহানবীর নিকট ছুটে গেলেন ও তাঁর পদপ্রান্তে তরবারি সমর্পণ করে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করলেন।

কাহিনী সংক্ষেপ

আযানের ধ্বনি শুনে কবি সচকিত হয়ে উঠেছেন। এ আযানের ধ্বনির সঙ্গে হযরত উমরের (রা) স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। ইসলাম দিনে দিনে জ্যোতিহীন হয়ে পড়ছে। উমর তুমি আরেকবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হও। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য আমরা লোহিত সাগরকে আরও লাল করে মৃত্যু বরণ করি।

ধুলার সিংহাসনে বসে তুমি অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছ। তোমার খেজুর পাতার প্রাসাদ বারবার ভেঙে পড়েছে - কিন্তু তুমি ভেঙে পড়নি। লোভ-লালসা ঐশ্বর্যের মোহ তোমাকে কোন দিন স্পর্শ করেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'উমর ফারুক' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?
   ক. গোলাম মোস্তফা খ. ফররুখ আহমদ
   গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শাহাদত হোসেন

২. উমর ফারুক কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত?
   ক. জিঞ্জীর খ. মরু ভাস্কর
   গ. অগ্নিবীণা ঘ. বিষেরবাঁশী

৩. আযানের সঙ্গে কার স্মৃতি জড়িয়ে আছে?
   ক. হযরত উমরের খ. হযরত আবু বকরের
   গ. মহানবীর ঘ. আরব দেশের

৪. ইসলামকে কবি কি বলেছেন?
   ক. পরশ মানিক খ. মূল্যবান মানিক
   গ. সাম্যের ধর্ম ঘ. শ্রেষ্ঠ ধর্ম

৫. 'তখত' শব্দের অর্থ কি?
   ক. কাঠ নির্মিত আসন খ. বিশেষ আসন
   গ. সিংহাসন ঘ. মূল্যবান চেয়ার

খ. সত্য হলে স মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. 'উমর ফারুক' কবিতায় কবি উমর ফারুকের ন্যায় নিষ্ঠতার কথা বলেছেন।
২. হযরত উমরের সঙ্গে আযানের স্মৃতি বিজড়িত নেই।
৩. উমর ছিলেন মহানবীর দক্ষিণ বাহু।
৪. ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য ভগ্নিপতি ও বোনকে অত্যাচার করেন নি।
৫. উমর মহানবীর পদতলে তরবারি সমর্পণ করে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. কাজী নজরুল ইসলাম ২. ক. জিঞ্জীর ৩. হযরত উমরের
৪. ক. পরশ মানিক ৫. গ. সিংহাসন

খ. ১. স ২. মি ৩. স ৪. মি ৫. স

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হযরত উমরের জেরুজালেম যাত্রার বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

হেরি পশ্চাতে চাহি-
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিল্লা যেথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা বলেছে শত্রু শেষে-
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।
হায়রে, আধেক ধরার মালিক আমির-উল-মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দু খানা শুকনো 'খবুজ' রুটি
একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দুতিন মুঠি।
প্রহরী-বিহীন সম্রাঁ চলে একা পথে উটে চড়ি
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি!
মরুর সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে
সে আগুন তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে।
কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, 'ভাই
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে,
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।'

ভৃত্য দম্ভ চুমি
কাঁদিয়া কহিল, 'উমর কেমনে এ আদেশ কর তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি?'
খলিফা হাসিয়া বলে,
'তুমি জিতে গিয়ে বড় হতে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে।
রোজ-কিয়ামতে আল্লাহ্ যে দিন কহিবে, 'উমর! ওরে
করে নি খলিফা, মুসলিম জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে'

কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই।
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু, মোর অধিকার নাই।
আরাম সুখের, মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে, সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠের উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কিনা,
কি গান গাহিল মানুষে সে দিন বন্দী' বিশ্ববীণা।
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব'।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

হেরি – দেখে, **জেরুজালেম** – প্যালেস্টাইনের একটি প্রাচীন শহর, **কিল্লা** – দুর্গ, **খবুজ রুটি** – শুকনো রুটি **মশক** – পানি রাখার চামড়ার পাত্র, **পেরেশান** – ক্লান্ত, **দম্ভ** – বাত, **গোলাম** – ভৃত্য, **রোজ কেয়ামত** – শেষ বিচারের দিন, **জাঁহা** – দুনিয়া, **বন্দি** – বন্দনা করে, **স্তব** – প্রশংসা, **অনাগত** – যা এখনও আসেনি।

কাহিনী সংক্ষেপ

বহুদিন ধরে মুসলিম বাহিনী জেরুজালেমের দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে। শত্রুপক্ষ বলেছে উমর নিজে এসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলে তারা আত্মসমর্পণ করবে। তাই হযরত উমর চলেছেন জেরুজালেম অভিমুখে। একটি উটে চড়ে চলেছেন। উটের রশি ধরে একজন ভৃত্য। সঙ্গে কোন প্রহরী নেই। সঙ্গে আছে সামান্য খাদ্য ও পানীয়। কিছুদূর যেয়ে উমর উট থেকে নেমে ভৃত্যকে উটে চড়তে বললেন। উটে ভৃত্যকে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরে হেঁটে চললেন। সেদিন মহাসাম্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মুসলিম বাহিনী কোন দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল?
   ক. ইহুদিদের দুর্গ — খ. জেরুজালেমের দুর্গ
   গ. মক্কার দুর্গ — ঘ. আবিসিনিয়ার দুর্গ

২. হযরত উমরের জেরুজালেম যাত্রার সময় কে সঙ্গে ছিল?
   ক. একজন প্রহরী — খ. অনেক সৈন্য-সামন্ত
   গ. একজন মাত্র ভৃত্য — ঘ. বহু দাস-দাসী

৩. ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়ানোতে উমরের চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
   ক. মানব প্রেম — খ. ভৃত্যের প্রতিভালোবাসা
   গ. বিনয়ী — ঘ. স্বজাতিপ্রীতি

৪. ইসলাম মানুষ সম্পর্কে কি বলে?
   ক. সকলে সমান — খ. কেউ ছোঁ, কেউ বড়
   গ. কেউ ধনী কেউ নিধন — ঘ. কেউ কেউ সুবিধাভোগী

৫. 'আমীরুল মুমেনিন' শব্দের অর্থ কোনটি?
   ক. বিশ্ববাসীর নেতা — খ. জাতীয় নেতা
   গ. বিশ্ববাসীদের নেতা — ঘ. বিশ্বভ্রাতৃত্বের নেতা

খ. এক কথায় /বাক্যে উত্তর দিন

১. কোন কিল্লা মুসলিম বাহিনী অধিকার করে ছিল?
২. সন্ধিপত্রে কে স্বাক্ষর করলে শত্রু আত্মসমর্পণ করবে?
৩. উমরের ঝুলিতে কি ছিল?
৪. নিজে উট থেকে নেমে ভৃত্যকে কি করতে বললেন?
৫. ইসলাম কি বলে?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. জেরুজালেম দুর্গ ২. গ. একজনমাত্র ভৃত্য ৩. ক. মানবপ্রেম
৪. ক. সকলে সমান ৫. গ. বিশ্ববাসীদের নেতা

খ. ১. জেরুজালেমের কিল্লা ২. হযরত উমর ৩. দুখানা শুকনো খবুজ রুটি
৪. উটে চড়ে বসতে বললেন ৫. সকলে সমান

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হযরত উমরের নির্ভিকতার পরিচয় দিতে পারবেন।
- উমরের দায়িত্ববোধ ও কোমল মনের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উমরের ন্যায়নিষ্ঠার উদাহরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,
সত্যব্রত যে তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালিদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ববিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

****

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে তব মহত্ত্ব কথা-সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে
কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়।
শুনিয়া সকল-কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বায়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আঁা নিজ হাতে,
বলিলে, 'এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ সব দুখিনী মায়ের ঘরে।'

কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, 'বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোয-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে আজি, তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি, চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে!

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক' অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে!
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি-
'অপরাধ করে তোরি মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী।'

আবু শাহমার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে।
খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটিমাত্র পিরান কাচিয়া শুকায় নি তাহা বলে,
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা তলে।
হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাঁ!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

সত্যব্রত – সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান, **সিপাহসালার** – সেনাপতি, **ক্ষুধাতুর** – যার ক্ষুধা লেগেছে।
বায়তুল মাল – যেখানে সরকারী মাল রাখা হয়, **রোজ কিয়ামত** – শেষ বিচারের দিন, **প্রায়শ্চিত্ত** – অপরাধের জন্য নিজের ইচ্ছায় যে শাস্তি গ্রহণ করা হয়, **নিশীথ** – রাত্রি, **দোর্রা** – চাবুক, **পাষাণ** – পাথর, **গোর** – কবর, **পিরান** – জামা
খলিফাতুল মুসলেমিন – মুসলমানদের খলিফা, **চীর** – ছেঁড়া কাপড়, **নান্দীপাঠ** – প্রশংসা করা,
খালেদ – খালেদ বিন ওয়ালিদ ইসলামের ইতিহাসের একজন খ্যাতনামা বীর। তাঁর অসামান্য বীরত্বে ইসলামি রাজ্যের সীমানা বেড়ে যায়। তিনি ইরান ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করেন।
খালেদ খলিফার কাছে যুদ্ধব্যয়ের হিসাব দিতে ব্যর্থ হন। এজন্য খলিফা উমর তাঁকে পদচ্যুত করেন। মহান বীর খালেদ নীরবে এ শাস্তি মেনে নেন।
আবু শাহমা – উমর ফারুকের পুত্র। মদ্যপান ও ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত পুত্রকে উমর নিজ হাতে শাস্তি দেন। তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হয়। এতেই আবু শাহমার মৃত্যু ঘটে।

কাহিনী সংক্ষেপ

উমর ছিলেন নির্ভীক ও সত্যবাদী। মহাবীর খালেদকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে দ্বিধা করেননি।
উমর ছিলেন মানবপ্রেমিক। সেজন্য নিজের পিঠে খাদ্য বহন করে ক্ষুধাতুর শিশুদের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল যেমন কোমল তেমনি কঠোর। অপরাধের জন্য নিজের পুত্রকেও তিনি ক্ষমা করেননি।

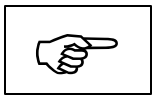

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. খলিফা মহাবীর খালেদকে কিসে পরিণত করেছিলেন?
   ক. মামুলি সেনায় খ. সাধারণ সেনাপতিতে
   গ. শাসকে ঘ. কর-নির্ধারকে

২. মা ও শিশুকে কাঁদতে দেখে হযরত উমর কি করলেন?
   ক. তাদের কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দিলেন খ. পরদিন দেখা করতে বললেন
   গ. নিজে পিঠে করে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিলেন ঘ. তাদের আশ্বাস দিলেন

৩. নিজের অপরাধী পুত্রের জন্য উমর কি করলেন?
   ক. কোন ব্যবস্থা নেননি খ. কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন
   গ. ক্ষমা করেছিলেন ঘ. সাবধান করে দিয়েছিলেন

৪. হযরত উমরকে চীরধারী সম্রাঁ কেন বলা হয়েছে?
   ক. ছিন্ন পোশাক পরতেন বলে খ. একটি পোশাক পরতেন বলে
   গ. অনেক পোশাকের মধ্যে একটি ছিন্ন ছিল বলে
   ঘ. জমকাল পোশাক পরতেন বলে

৫. আবু শাহমা কে?
   ক. একজন অপরাধী খ. একজন মদ্যপ
   গ. আরবের অধিবাসী ঘ. খলিফা উমরের পুত্র

খ. এক কথায় /বাক্যে উত্তর দিন

১. সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়' - কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
২. নগর ভ্রমণে বের হয়ে দুটি শিশুকে কি করতে দেখলেন?
৩. বায়তুল মাল থেকে কি নিলেন?
৪. খলিফা উমর কি ন্যায় পরায়ণ ছিলেন?
৫. কে মানুষকে ভাই বলেছে?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ক. মামুলি সেনায় ২. গ. নিজে পিঠে করে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিলেন
৩. খ. কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন ৪. ক. ছিন্ন পোশাক পরতেন বলে
৫. ঘ. খলিফা উমরের পুত্র

খ. ১. খলিফা উমর ২. ক্ষুধায় কাঁদতে দেখলেন ৩. ঘৃত-আঁা
৪. ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন ৫. খলিফা উমর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক

১. 'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে হযরত উমরের জেরুজালেম যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করুন।
২. 'তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন' - কার স্মৃতির কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি কথাটি বর্ণনা করুন।
৩. খলিফা উমরের মানব প্রেমের পরিচয় আছে এমন একটি ঘটনা লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'আহ্বান নয় - রূপ ধরে এস! গ্রাসে অন্ধতা রাহু' কে কাকে আহ্বান করেছে? অন্ধতা রাহু কী?
২. জেরুজালেমের পথে খলিফার সঙ্গে ভৃত্যের ব্যবহার কেমন ছিল?
৩. খলিফা নিজ পিঠে খাদ্য বহন করেছিলেন কেন?
৪. শাহমা কে? উমর তাকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. সে দিন গিয়াছে শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।
২. সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।
৩. মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের - মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে ' সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।
৪. এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক অপমান।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : উমর ফারুক কবিতা অবলম্বনে হযরত উমরের জেরুজালেম যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করুন।

উত্তর : কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'উমর ফারুক' কবিতায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমরের জীবনের স্মরণীয় চিত্রকে অঙ্কন করেছেন। এমনি একটি জীবনচিত্র খলিফার জেরুজালেম গমন।

বহুদিন ধরে মুসলিম বাহিনী জেরুজালেম দুর্গ অবরোধ করে আছে। শেষে শত্রুরা জানিয়েছে হযরত উমর যদি নিজে এসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে তবেই তারা আত্মসমর্পণ করবে। তাই খলিফা উমর জেরুজালেম চলেছেন। তাঁর সঙ্গে একজন মাত্র ভৃত্য-উটের রশি ধরে সামনে চলেছে। সঙ্গে আছে সামান্য খাদ্য ও পানি।

দুরন্ত দিন শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। কিছুদূর যেয়ে উমর উট থেকে নামলেন ও ভৃত্যকে উটে চড়ে বসতে বল্লেন। খলিফা এবার উটের দড়ি ধরে হেঁটে যাবেন। এ কথা শুনে ভৃত্য কেঁদে ফেলল। এ কি করে সম্ভব। কিন্তু খলিফার কথা মানতেই হল। উমর বললেন তিনি মানুষের প্রতিনিধি মাত্র। প্রত্যেক মানুষ সমান। তাই তিনি অন্যের সেবা নিতে পারেন না। পথ চলার কষ্ট দুজনকেই সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। পালাক্রমে হেঁটে খলিফা ও ভৃত্য জেরুজালেম পৌঁছালেন।

খলিফা উমরের জেরুজালেম যাত্রার কাহিনীতে ন্যায়বান বিবেচক ও মানবপ্রেমিক উমরের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। জেরুজালেম যাত্রার কাহিনী এজন্য অবিস্মরণীয়।

প্রশ্ন : খলিফা উমরের মানবপ্রেমের পরিচয় আছে এমন একটি কাহিনী লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও গানে ইসলামের কিছু ঘটনা-কাহিনী ও অনুভূতিকে চমকপ্রদভাবে রূপায়িত করেছেন। আলোচ্য উমর ফারুক কবিতায় ইসলামি খেলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের মানবপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা ও অতুলনীয় চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যকে অপূর্ব বাণী ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন।

হযরত উমর ছিলেন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু নিজেকে সব সময়ে জনগণের সেবক বলেই মনে করতেন। তিনি প্রায়ই নিজের চোখে রাজ্যের অধিবাসীদের অবস্থা দেখার জন্য রাতে নগর ভ্রমণ করতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন দুটি ক্ষুধার্ত শিশু তাদের মাকে ধরে কাঁদছে। অসহায় মা শিশুদের ভোলাবার জন্য শূন্য হাড়ি উনানে চাপিয়ে রান্নার অভিনয়

করছেন। মা নিজেও অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এ দৃশ্য দেখে উমর ফারুক ব্যথিত হলেন। তিনি বুঝলেন এ ব্যর্থতা তারই। তিনি খলিফা হলেও রাজ্যে ক্ষুধার্ত নারী ও শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তখনই বায়তুল মালে গিয়ে নিজের পিঠে বহন করে আনলেন ঘৃত-আঁা। ক্ষুধার্ত শিশু ও মায়ের কাছে সে খাদ্য পৌঁছে দিলেন। অনেকেই খাদ্যের বোঝা বইতে চেয়েছিল। কিন্তু উমর তা দেননি। কবির ভাষায় উমরের
উক্তি ---------- এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এসব দুঃখিনী মায়ের ঘরে।
হযরত উমর যথার্থ মানবপ্রেমিক ছিলেন। তাই মানুষের জন্য তার অনুরাগ ও ভালোবাসা ছিল প্রবল। উপরের ঘটনাটিতে হযরত উমরের সেই মানবপ্রেমকেই আমরা লক্ষ করি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : আহ্বান নয়-রূপ ধরে এস! গ্রাসে অন্ধতা রাহু। কে কাকে কেন বলেছে? অন্ধতা রাহু কী?
উত্তর : উদ্ধৃত চরণটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'উমর ফারুক' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি কবির স্বাগত-ভাষণ। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।
পৃথিবী আজ পঙ্কিল আবর্তে একটি অন্ধকার যুগে প্রবেশ করেছে। মানবতা আজ বঞ্চিত-নারীশিশু নির্যাতিত। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র কোথাও নেই। রাহুর মত কোন অপদেবতা যেন সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করেছে। তাই পৃথিবীতে আজ শুধু অন্ধকার এ অন্ধকার থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য কবি উমরকে পৃথিবীতে রূপ ধরে ফিরে আসতে বলেছেন। কারণ উমরই পারেন এ অন্ধকার বিনাশ করে পৃথিবীকে আলোকে উদ্ভাসিত করতে এবং পৃথিবী থেকে অমানবিক ও অন্যায়কে দূর করতে।

প্রশ্ন : খলিফা নিজ পিঠে খাদ্য বহন করেছিলেন কেন?
উত্তর : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এক রাতে অধিবাসীদের দেখার জন্য ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় একটি বেদনাদায়ক চিত্র তার চোখে পড়ল। দুটি ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষুধায় কাঁদছে। আর মা শিশুদের ভোলানোর জন্য রান্নার অভিনয় করছে। রাজ্যের সকল নাগরিকের অন্ন-বস্ত্রের দায়িত্ব শাসকের। উমর বুঝলেন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। নিজের কৃত অপরাধের জন্য তিনি তাঁর অক্ষমতা ও পাপ থেকে মুক্তির জন্য উমর নিজের পিঠে করে খাদ্য বহন করে ঐ দুঃস্থ মায়ের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : শাহমা কে? উমর তাকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?
উত্তর : আবু শাহমা হযরত উমরের পুত্র। মদ্যপান ও ব্যভিচারের কারণে উমর তাঁর পুত্রের বিচার করেছিলেন। তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ৮০টি দোর্রা বা বেত্রাঘাত করার। উমর নিজে হাতে তাকে দোর্রা মেরেছিলেন। বেত্রাঘাতে আবু শাহমা মারা যায়।
ন্যায় বিচারক উমরের এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নিজের পুত্র অপরাধী বলে সে ক্ষমা পাবে খলিফা উমর তা করেন নি।

ব্যাখ্যা

সেদিন গিয়াছে শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।

উদ্ধৃত অংশটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'উমর ফারুক' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে দূর অতীতের কথা স্মরণ করা হয়েছে।
পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ইসলামের স্বর্ণযুগ যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উমর একজন। আযানের ধ্বনিকে কবির মনে হয়েছে 'পাপিয়ার ডাক' 'চকোরীর গানের' মত মোহনীয়। আযানের সঙ্গে উমরের নিজের নামও জড়িত। আযান ইসলামের প্রতীক। তাই আযান শুনে কবি চমকে উঠেন। ভাবেন - ইসলামের সেই স্বর্ণযুগ কি ফিরে এসেছে। কিন্তু না তা নয়। সেদিন - সেই সময় বহু আগেই গত হয়েছে। সময় থেমে থাকে না। শিয়রের কাছে কালের ঘড়ি চলে ঠিক ঠিক করে। সে কখনও পিছনে ফেরে না।
পৃথিবীর অন্ধকার কাটিয়ে উঠার জন্য আজ হযরত উমরের বড় প্রযোজন। কিন্তু সময় আর ফেরে না। উমর আজ দূর স্মৃতি মাত্র।

মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের - মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!
ইসলাম বলে 'সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।

উদ্ধৃত অংশটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'উমর ফারুক' রচিত নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে উমরের মানবতাবোধ ও ইসলামের মহত্বের কথা বলা হয়েছে।

ইসলামি খেলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর তাঁর গণতান্ত্রিকবোধের কথা বলেছেন। তিনি খলিফা হলেও আরাম সুখ ও বিলাসের তাঁর অধিকার নেই। মানুষ হয়ে অন্য মানুষের সেবা তিনি নিতে পারেন না। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কেউ ছোঁ নয় - কেউ বড় নয়। তাই কষ্টকর রোদ্রদগ্ধ পথে চলার সময় উমর পালাক্রমে উটের রশি ধরে হেঁটে চলেছিলেন।

একদিকে শাসক উমরের মানবতাবোধ ও মানবপ্রেম কেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ইসলাম ধর্মের সাম্য, ঐক্য ও স্বাধীতার অমরবাণী উদ্ধৃত অংশে ফুটে উঠেছে।

এত যে কোমল প্রাণ
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক অপমান!

উদ্ধৃত অংশটি কবি কাজী নজরুল সসলাম রচিত 'উমর ফারুক' কবিতা থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে হযরত উমরের ন্যায়-পরায়ণতার কথা বলা হয়েছে।

উমরের হৃদয় চির কোমল। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনাকে তিনি প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। খলিফার ব্রত মানুষের সেবা করা। ইসলাম বলেছে সকল মানুষ সমান। তাই প্রতিটি মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন। নিজের পিঠে বোঝা বহন করে দরিদ্র-দুঃখী মানুষের খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। এত কোমল যাঁর প্রাণ কর্তব্য কর্মে কিন্তু তিনি ছিলেন অচল । অপরাধী নিজের পুত্রকে পর্যন্ত ক্ষমা করেন নি। নিজের হাতে মদ্যপ পুত্রকে বেত্রাঘাত করেছেন। সে বেত্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে পুত্রের। কিন্তু ন্যায়বিচার করতে উমর দ্বিধা করেন নি।

উমরের হৃদয় ছিল যেমন ফুলের মত কোমল অন্য দিকে তাঁর হৃদয় ছিল ইস্পাতের মত কঠিন। দয়া দেখাতে যেয়ে অন্যায় করেন নি কখনও। এ কথাটিই আলোচ্য অংশের মর্মবাণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

f õ‡ho¡

RmxgD``xb

লেখক পরিচিতি

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে RmxgD``xb ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালাতে লেখাপড়ার সূচনা। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯২৯ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি.এ ও ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এম পাস করেন।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশ সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে কাজ করেন। ১৯৩৮ সালে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সরকারের প্রচার বিভাগে যোগদান করেন।

RmxgD``x‡bi কবিতায় পল্লী মানুষের কথা, তাদের সুখ দুঃখ স্থান পেয়েছে। পল্লীর প্রকৃতি ও স্থান পেয়েছে। এ কারণেই তাঁকে পল্লী কবি বলা হয়। RmxgD``xb যখন কলেজের ছাত্র তখনই তাঁর 'কবর' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ও গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। RmxgD``x‡bi প্রধান কাব্যগুলো হচ্ছে- রাখালী (১৯২৭), নক্সীকাঁথার মাঠ (১৯২৯), ধানক্ষেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাঁ (১৯৩৪), রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫)। শিশুতোষ গ্রন্থ - হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশি (১৯৪৯)। স্মৃতিকথা - তাঁদের দেখেছি (১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬৮) ইত্যাদি।

১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

পল্লীবর্ষা কবিতাটি RmxgD``x‡bi Ôধানখেত' কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় বর্ষণমুখর দিনের পল্লী প্রকৃতি ও মানুষের রূপ-চিত্র অঙ্কন করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বর্ষণমুখর পল্লী প্রকৃতির একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের আড়ে
কেয়া-বন-পথে স্বপন বুনিছে ছল ছল জলধারে।
কাহার ঝিয়ারি কদম্ব-শাখে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
ছোঁ ছোঁ রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায়!
বাদলের জলে নাহিয়া সেমেয়ে হেসে কুটি কুটি হয়,
সে হাসি তাহার অধর নিঙাড়ি লুটাইছে বনময়।
কাননের পথে লহর খেলিছে অবিরাম জলধারা,
তারি স্রোতে আজি শুকনো পাতারা ছুটিয়াছে ঘরছাড়া।
হিজলের বন ফুলের আখরে লিখিয়া রঙিন চিঠি,
নিরালা বাদলে ভাসায়ে দিয়েছে না জানি সে কোন্ দিঠি!
চিঠির ওপরে চিঠি ভেসে যায় জনহীন বন-বাটে
না জানি তাহারা ভিড়িবে যাইয়া কার কেয়া-বন-ঘাটে।

কোন্ সে বিরল বুনো ঝাউ-শাখে বুনিয়া গুলাবি শাড়ি-
হয়তো আজিও চেয়ে আছে পথে কানন-কুমার তারি!
এদিকে দিগন্তে যতদূর চাহি, পাংশু মেঘের জাল,
পায়ে জড়াইয়া পথে দাঁড়ায়েছে আজিকার মহাকাল।

শব্দার্থ

আড়ে - আড়ালে, **ঝিযারি**- কন্যা, **রেনু**- পরাগ, **অস্ফুট** - যা এখনও ফোটেনি, **কানন**- বন, **মহাকাল**- অনন্তকাল

কাহিনী সংক্ষেপ

বর্ষায় পল্লী প্রকৃতি অভিনব রূপ ধারণ করে। ঘোলাটে মেঘের আড়ালে আজকের রোদ হারিয়ে গেছে। বৃষ্টির অবিরল ধারা অপূর্ব ছন্দ ও সুরমাধুর্য সৃষ্টি করেছে। কদম ফুল ফুটতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জলে স্নাত কদমফুল যেন হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। বনপথে জলের ধারায় ভেসে যাচ্ছে শুকনো পাতা। প্রস্ফুটিত হিজল জলধারায় পাঠিয়ে দিচ্ছে পুষ্পের উপহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'পল্লীবর্ষা' কবিতাটি কার রচনা?
   ক. জসীমউদ্দীন খ. আহসান হাবীব
   গ. কায়কোবাদ ঘ. ফররুখ আহমদ

২. নিচের কোন কাব্যটি RmxgD``xb রচিত?
   ক. সারাদুপুর খ. ধানখেত
   গ. সাঁঝের মায়া ঘ. বলাকা

৩. কবি কাকে ঝিয়ারী বলে সম্বোধন করেছেন?
   ক. কদম ফুলকে খ. কেয়া ফুলকে
   গ. হিজল ফুলকে ঘ. শাপলা ফুলকে

খ. সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. RmxgD``xb‡K পল্লী কবি বলা হয়।
২. কাজী নজরুল ইসলাম 'সোজন বাদিয়ার ঘাঁ' রচনা করেন।
৩. 'পল্লীবর্ষা' কবিতায় কবি বর্ষায় পল্লী প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন।
৪. মোড়লের বৈঠকখানায় বুড়োলোকটি রূপকথা বলে।
৫. ঘোর বর্ষায় মেয়েরা মাঠে কাজ করতে যায়।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ক. জসীমউদ্দীন ২. খ. ধানখেত ৩. ক. কদদম ফুলকে

খ. ১. স ২. মি ৩. স ৪. স ৫. মি

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বৃষ্টি মুখর দিনে পল্লীর মানুষেরা কি করে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

গাঁয়ের চাষিরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়,
গল্পে গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়!
কেউ বসে বসে বাখারি চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রশি,
কেউবা নতুন দোয়াড়ির গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি।
কেউ তুলিতেছে বাঁশের লাঠিতে সুন্দর করে ফুল,
কেউ বা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে নির্ভুল।
মাঝখানে বসে গাঁয়ের বৃদ্ধ, করুণ ভাটির সুরে
আমির সাধুর কাহিনী কহিছে সারাটি দলিজা জুড়ে।
লাঠির ওপরে, ফুলের ওপরে আঁকা হইতেছে ফুল,
কঠিন কাঠ সে সারিন্দা হয়ে বাজিতেছে নির্ভুল।
তারি সাথে সাথে গল্প চলেছে, আমির সাধুর নাও
বহু দেশ ঘুরে আজিকে আবার ফিরিয়াছে নিজ গাঁও।
ডাব্বা হুঁকাও চলিয়াছে ছুটি এর হাতে ওর হাতে,
নানান রকম রশি বুনানও হইতেছে তার সাথে।

বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেঘ ডাকে,
এ সবের মাঝে রূপকথা যেন আর রূপকথা আঁকে।
যেন ও-বৃদ্ধ, গাঁয়ের চাষিরা, আর ওই রূপকথা,
বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্পলতা।
বউদের আজ কোন কাজ নাই, বেড়ায় বাঁধিয়া রশি,
সমুদ্রকলি শিকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।
কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতার মায়াবী আখর টানি।
আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলছল জলধারে,
বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

দলিজায় – বৈঠকখানায়, **বাখারি** – বাঁশের ফালি, **সারিন্দা** – গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্র, **ডাব্বাহুকা** – নারকেলের মালায় তৈরি হুকা, **কল্পলতা** – কল্পনার কাহিনী

কাহিনী সংক্ষেপ

বর্ষামুখর দিনে গ্রামের লোকেরা জমা হয় মোড়লের বৈঠকখানায়। গ্রামীণ মানুষ তাদের কাজ ফেলে আসে না। এখানেই কেউ বাখারি চাঁচে, কেউ লাঠির গায়ে ফুল আঁকে, কেউ সারিন্দা তৈরি করে। গ্রামের সবচেয়ে বুড়ো লোকটি আমীর সাধুর কাহিনী বলে। রূপকথার গল্প জমে যায়। পল্লীবধুর আজ কোন কাজ নেই। কেউ তৈরি করে সমুদ্রকলি শিকা, কেউ বা নকশি কাঁথার ফুল বুনে চলে। অব্যক্ত স্বপ্নের কথা মায়াবি পরশে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

ক. এক কথায়/বাক্যে উত্তর দিন।

১. গাঁয়ের চাষিরা কোথায় মিলিত হয়?
২. বাঁশের লাঠিতে কী করা হয়?
৩. গাঁয়ের বৃদ্ধ কী করেন?
৪. কাদের আজ কাজ নাই?
৫. কে সমুদ্রকলি শিকা বানায়?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. মোড়লের বৈঠকখানায় ২. ফুলতোলা হয় ৩. রূপকথা বলে ৪. বউদের ৫. মেয়েরা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কবি RmxgD``x‡bi 'পল্লীবর্ষা' কবিতা অবলম্বনে বর্ষা প্রকৃতির একটি বর্ণনা দিন।
২. বর্ষণমুখর দিনে পল্লীর মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাদলের জলে 'নাহিয়া' কে হেসে কুটিকুটি হয়? বুঝিয়ে লিখুন।
২. গাঁয়ের চাষিরা কোথায় মিলিত হয়েছে? কি করছে তারা?

গ. ব্যাখ্যা

১. আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলছল জলধারে,
বেণু বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : কবি জসীমউদ্‌দীনের 'পল্লীবর্ষা' কবিতা অবলম্বনে বর্ষা প্রকৃতির একটি বর্ণনা দিন।

উত্তর : কবি RmxgD``x‡bi 'পল্লীবর্ষা একটি অনবদ্য কবিতা। বাংলাদেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রবিন্দু বর্ষা কাল। বর্ষা অনেক সময় দুঃখ-তাপ নিয়ে আসে বটে কিন্তু বর্ষা ছাড়া আমাদের চলে না। এ বর্ষার রূপে মুগ্ধ হয়ে মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু কবি কবিতা রচনা করেছেন। RmxgD``xbI এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন।

পল্লীর বর্ষা ও পল্লীর প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকমের। কবি RmxgD``xb দেখেছেন বর্ষাকে পল্লীর প্রেক্ষাপটে। পল্লীর সাধারণ চিত্র এখানে অসাধারণ চিত্রকল্পে ফুটে ওঠেছে। বর্ষার প্রকৃতি অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। এ বৃষ্টির যেন শেষ নেই। আজ আর সূর্যের রোদ উঠবে না। কবির মনে হয়েছে "ঘোলাটে মেঘের আড়ে" আজ রোদ ঘুমিয়ে পড়েছে। ছলছল, কলকল জলধারার শব্দ শোনা যাচ্ছে কেয়া-বন পথে। কদম শাখায় থোকায় থোকায় কদম ফুল ফুটে আছে। অস্ফুট কলিকাগুলো ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কদমকলি মেয়েদের মত হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। বনপথে ছুটেছে জলধারা। শুকনো পাতার, বাশি তাতে ছুটে যাচ্ছে। মনে বাদল ধারায় অজানার উদ্দেশ্যে কেউ চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ চিঠির জন্যই হয়তো কোন কানন কুমার অপেক্ষা করে আছে।

আকাশে যতদূর দৃষ্টি যায় - শুধু মেঘ আর মেঘ। সে মেঘ পাংশু মেঘ। মনে হচ্ছে মহাকাল যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

অল্পকথায় কবি RmxgD``xb পল্লী প্রকৃতির বর্ষাকে তাঁর লেখনী দিয়ে এঁকেছেন। শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য, পল্লীর উপকরণ ব্যবহারে পল্লীর বর্ষা এ কবিতায় জীবন্ত হয়ে ওঠেছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : বাদলের জলে 'নাহিয়া' কে হেসে কুটিকুটি হয়? বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : 'পল্লীবর্ষা' কবিতাটি RmxgD``xb রচনা করেছেন। এতে অঙ্কিত হয়েছে পল্লী প্রকৃতির রূপ। কবি কবিতার এক স্থানে বলেছেন - বাদলের জলে নাহিয়া সে মেয়ে হেসে হয় কুটিকুটি। অমোর ধারার বৃষ্টির মাঝে কদম ফুলের কলিকাগুলো বিকশিত হয়। কদম ফুলের কলিকাগুলো চোখ খুলেই দেখে বর্ষার অক্লান্ত ঝর্ণাধারা। বাদল হাওয়ার সাথে সাথে তারাও নেচে গেয়ে ওঠে। উচ্ছল-উজ্জ্বল বালিকা যেমন হেসে কেঁদে অস্থির হয় তেমনি বালিকার মত সদ্য প্রস্ফুটিত এই কদমফুলগুলো যেন বর্ষার জলে গেয়ে, হেসে-খেলে অস্থির হয়। তাই কবি বর্ষণ সিক্ত কদম ফুলের সঙ্গে কদম ফুলের তুলনা করেছেন।

Suk¡œ¡
A¡ëm L¡¢cI

লেখক পরিচিতি

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল কাদির ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইসিধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯২৫ সালে আই এস সি পাস করেন। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস.সি পড়েন।
আব্দুল কাদির প্রথম জীবনে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রকাশনা অফিসার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।
আব্দুল কাদির একাধারে কবি, গবেষক ও প্রবন্ধকার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, কাব্য- দিলরুবা (১৯২৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭)।
প্রবন্ধ - বাংলা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৪), কবি নজরুল (১৯৭০), ছন্দ সমীক্ষণ (১০৭৯) ইত্যাদি।
তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ - নজরুল রচনাবলী (১-৫ম খণ্ড), সিরাজী রচনাবলী ও রোকেয়া রচনাবলী।
১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কবি আব্দুল কাদির মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

আব্দুল কাদির রচিত 'জয়যাত্রা' কবিতাটি একটি উদ্দীপনামূলক কবিতা। এখানে কবি নবীনদের ডাক দিয়েছেন চির কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবার জন্য। পৃথিবীতে যে নবজাগরণ শুরু হয়েছে তাতে তরুণদের সামিল হতে হবে - এটাই কবির বক্তব্য।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কবি তরুণদের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

যাত্রা তব শুরু হোক হে নবীন, কর হানি দ্বারে
নবযুগ ডাকিছে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শংকিত আলোক শিহরায়।
সুপ্তি ত্যাজি বরি লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান,
দেখা দিক শাশ্বত কল্যাণ।

সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে দাও দ্বার,
আনো তব নব উপহার।
নিলিখ-মানব মিলি বিশ্বপ্রান্তে পাতিয়াছে মেলা-
উদ্বোধনী বাণী তার তুমি আসো গাহো এই বেলা।

উদার পরান মেলি সবাকার লহ আলিঙ্গন,
দৃঢ় হোক আত্মার বন্ধন।
ক্রন্দিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত করো তারে
নিয়ে চলো আলো অভিসারে।

পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল-
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচঞ্চল।
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক, সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ।

অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি, হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন-উল্লাসে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

কর – হাত, **বাতায়ন** – জানালা, মাগি – কামনা করে, **ত্যাজি** – ত্যাগ করে, **বরি লও** – বরণ বা গ্রহণ করে নাও।
শাশ্বত – চিরকালের, **সৃজন** – সৃষ্টি, **ক্রন্দিছে** – কাঁদছে, **লঙ্ঘি** – লঙ্ঘন করে, অতিক্রম করে।

কাহিনী সংক্ষেপ

নবযুগ তরুণদের ডাক দিয়েছে। চিরকালের কল্যাণের জন্য সকল অলসতা তরুণদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। সৃষ্টির উৎসবে পৃথিবী আজ মুখর। বিশ্বসভায় প্রাণের মিলনে আজ তরুণদেরও স্থান করে নিতে হবে। বন্দী ও বঞ্চিতকে মুক্ত করে আলোকেও অভিসারে নিয়ে যেতে হবে। তরুণদের জয় হবে নিশ্চয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'জয়যাত্রা' কবিতাটি কার রচনা?
ক. সুফিয়া কামাল খ. আল মাহমুদ
গ. আব্দুল কাদির ঘ. আহসান হাবীব

২. কোন কাব্যগ্রন্থটি আব্দুল কাদির রচিত?
ক. চক্রবাক খ. কল্পনা
গ. সারা দুপুর ঘ. দিলরুবা

৩. নবীনদের কে ডাকছে?
ক. নবযুগ খ. নববিশ্ব
গ. সতীর্থ ঘ. অগ্রপথিক

৪. "সুপ্তি ত্যাজি রবি লও তারে" কাকে?
ক. অতিথিকে খ. নববিশ্ব
গ. পথপ্রদর্শককে ঘ. নবযুগকে

৫. "অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক সত্যের প্রসাদ/পিয়ে লভ - স্বাদ"/শূন্য স্থানের শব্দটি কী?
ক. ক্ষণিকের খ. অমৃতের
গ. সুদূরের স্বাদ ঘ. অমর্ত্যের

খ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. আব্দুল কাদির 'নজরুল রচনাবলী' সম্পাদনা করেন।
২. 'জয়যাত্রা' কবিতাটি আহসান হাবীব রচনা করেন।
৩. আব্দুল কাদিরের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম "উত্তরবসন্ত"।
৪. 'জয়যাত্রা' কবিতায় বৃদ্ধদের জয়যাত্রার কথা বলা হয়েছে।
৫. বিশ্বসভায় কবি তরুণদের উদ্বোধনী গান গাইতে বলেছেন।
৬. 'জয়যাত্রা' কবিতাটি তরুণদের জন্য লিখিত।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. আব্দুল কাদির ২. ঘ. দিলরুবা ৩. ক. নবযুগ
৪. ঘ. নবযুগকে ৫. খ. অমৃতের

খ. ১. স ২. মি ৩. স ৪. মি ৫. স ৬. স

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক

১. 'জয়যাত্রা' কবিতায় কবি কাদের আহ্বান করেছেন? কেন করেছেন?
২. 'জয়যাত্রা' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শাশ্বত কল্যাণ কী? কবি কেন শাশ্বত কল্যাণ কামনা করেন?
২. কবি কাকে উদ্ধার করার কথা বলেছেন? তারা কাদের উদ্ধার করবে?

গ. ব্যাখ্যা

১. তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শংকিত আলোক শিহরায়।
২. অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি, হে নবীন, চল অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন উল্লাসে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : জয়যাত্রা' কবিতায় কবি কাদের আহ্বান করেছেন? কেন করেছেন?

উত্তর : 'জয়যাত্রা' আব্দুল কাদিরের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ কবিতায় কবি যারা নবীন ও তরুণদের আহ্বান করেছেন।

নবীন ও তরুণরাই চিরকাল পৃথিবীতে নতুনকে নিয়ে আসে। অন্ধকার থেকে আলোতে, কুসংস্কার থেকে মুক্তি - এসবই সম্ভব হয় তরুণদের অগ্রযাত্রার এবং তাদের অগ্রগামী চিন্তার ফলে। তরুণরাই চিরকাল স্বপ্ন দেখে সুন্দরের। তাই কবি নবীন ও তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন।

পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। এ যুগ হচ্ছে নব জাগরণের যুগ। পৃথিবীতে অন্যরা জেগে উঠেছে। তাই কবি তাঁর দেশের তরুণদের ডাক দিয়েছেন। তরুণদের উত্থান কামনা করে নবযুগ। সুপ্তিকে ত্যাগ করে কবি তাই তরুণদের জেগে উঠতে বলেছেন।

পৃথিবীতে আজ চলছে সৃষ্টির উৎসব। সেই সৃষ্টির উৎসবে তরুণদের সামিল হতে হবে। সেই মিলন মেলায় তরুণদের রচনা করতে হবে নতুন রাগিনী। সেখানে আত্মার বন্ধনকে করতে হবে দৃঢ়।

বিশ্বে যারা চিরকাল বঞ্চনার অন্ধকার ও কারাগারে বন্দী হয়ে রইল তাদেরকে শোনাতে হবে মুক্তির বাণী। অন্যায় ও অসত্য থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। অজস্র মৃত্যুর শঙ্কাকে জয় করে নবীনকে হতে হবে মৃত্যুজয়ী। জীবনের গভীর উল্লাস ধ্বনিত হবে তরুণদের বিজয়দৃপ্ত পদচারণায়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : কবি কাকে অন্যদের উদ্ধারের কথা বলেছেন? অন্যরা কারা?

উত্তর : কবি আব্দুল কাদির তাঁর 'জয়যাত্রা' কবিতায় তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই তরুণদেরই তিনি বলেছেন অন্যদের উদ্ধার করতে। এ অন্যরা হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের দল। যে মানুষেরা চিরকাল বঞ্চনার কারাগারে জীবন কাটিয়ে দিল - পৃথিবীর রূপ-রঙ-রস যাদের উপলব্ধিতে কোনদিন ধরা দেয়নি তাদের উদ্ধারের কথা কবি

বলেছেন। তাদের মুক্তি কেবল সম্ভব তরুণদের দ্বারাই - যারা প্রতিনিয়ত মানুষকে মুক্ত করে অন্ধকারের কুসংস্কারের বেড়ি থেকে।

ব্যাখ্যা উত্তর

২. অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি, হে নবীন, চল অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন উল্লাসে।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি আব্দুল কাদির রচিত 'জয়যাত্রা' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির কথা কবি বলেছেন।

বিশ্বসভায় তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন কবি। বঞ্চিত ও ব্যর্থ মানুষের মুক্তির জন্য তরুণদের এগিয়ে যেতে হবে। পথে আছে ভয় - আছে মৃত্যুর আশঙ্কা। সে সবকে পিছে ফেলে, পদদলিত করে একমাত্র এগিয়ে যেতে পারে তরুণের দল। মৃত্যুকে জয় করার আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করতে পারে তরুণরাই। তারাই পারে মৃত্যুঞ্জয়ী গান গাইতে।

কবি আব্দুল কাদির এ জন্যই নবীনদের সোচ্চার কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন। কারণ এ তরুণরাই পারে পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

A¢ik¡¢œL

p¢gu¡ L¡j¡m

লেখক পরিচিতি

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ২০শে জুন সুফিয়া কামাল বরিশাল জেলার শায়েস্তাগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাননি। পরিবারে উর্দুতে কথাবার্তার প্রচলন ছিল। তাঁর প্রথম স্বামী নেহাল হোসেনের সহায়তা পান সাহিত্য চর্চায়। কলকাতায় শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৯ সালে কামাল উদ্দীন খানের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। মহিলা সাপ্তাহিক 'সুলতানা' ও দিলরুবা' বহুদিন তিনি সম্পাদনা করেন। প্রগতিশীল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

প্রেম, প্রকৃতি, বেদনা ও বিরহ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবি। সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়াকাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭) ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাব্য। ১৯৯২ সালের ২০ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'অভিযাত্রিক' কবিতাটি কবি সুফিয়া কামালের 'স্বনির্বাচিত কবিতা' সংকলন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অভিযাত্রিক শব্দের অর্থ যে যাত্রা করে। কবি এখানে তরুণ অভিযাত্রিক দলের প্রশস্তি গান রচনা করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- জীবনের গৌরব কিসে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অভিযাত্রিকের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয়ে করে জয়
তাহাদের পরিচয়
লিখে রাখে মহাকাল,
সব যুগে যুগে সব কালে টিকা ভাস্বরে শোভে ভাল।
সব ক্ষয়ক্ষতি খেয়াল খুশিতে পশ্চাতে যায় ফেলে
বন্ধুর পথ একদা তাদের পদতলে ধরে মেলে
আনন্দ শতদল-
সেই তো জীবন, জয় গৌরবে হেসে ওঠে ঝলমল।

ঝড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
অভিযাত্রিক। নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
হয়তো বা ভুল। তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান
অন্য পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে

বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।
প্রাণের শিখার দীপ্তিতে জ্বলে ভাল,
হার মানে মহাকাল।
অনেক পাষাণ, অনেক পাথর, আর কত প্রান্তর
পার হয়ে আসে। মুক্তধারায় বারি সম ঝরঝর
নদী হতে চলে, বহে সিন্ধুর পানে
উর্বর করি ঊষরে। দু তীর শ্যামল করিয়া আনে
ফুল-ফসলেতে ভরা;
এই স্বাক্ষর তরুণ প্রাণের অরুণ রক্তক্ষরা।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

দুর্গম – যেখানে সহজে গমন করা যায় না, **দুর্জয়** – যা সহজে জয় করা যায় না, **টিকা** – কপালের ফোঁটা।
ভাস্বর – উজ্জ্বল, আলোকিত, **ভাল** – কপাল, **অভিযাত্রিক** – যে যাত্রা করে, **রক্তক্ষরা** – রক্তঝরা, **শতদল** – পদ্মফুল।

কাহিনী সংক্ষেপ

দুর্গম পথকে যারা জয় করে, দুর্জয়কে যারা জয় করে মহাকাল শুধু তাদেরই মনে রাখে। বন্ধুর পথকে যারা হেসে-খেলে পার হয়ে যায় তাদেরই জীবন গৌরবে ঝলমল করে ওঠে। ঝড়, বর্ষা, দুর্দিন কোন কিছুই অভিযাত্রীর পথচলা চন্ধ করতে পারে না। মহাকালও বুঝি তাদের কাছে হার মানে। নদীর ধারা যেমন দু-তীরের ঊষর ভূমিকে ঊর্বর করে তেমনি তরুণ অভিযাত্রিকের পথচলা আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'অভিযাত্রিক' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?
   ক. শামসুন্নাহার মাহমুদ খ. সুফিয়া কামাল
   গ. বেগম রোকেয়া ঘ. আশাপূর্ণা দেবী

২. 'অভিযাত্রিক' শব্দটির অর্থ কী?
   ক. অভিযান করে যে খ. দূরের যাত্রী
   গ. যে যাত্রা করে ঘ. বিমানের যাত্রী

৩. সেই তো জীবন, জয় গৌরবে হেসে ওঠে - শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে?
   ক. খলখল খ. অবিরল
   গ. অনাবিল ঘ. ঝলমল

৪. মহাকাল কাদের পরিচয় লিখে রাখে?
   ক. যারা বীরত্বপূর্ণ কাজ করে খ. যারা ধীর ও স্থির
   গ. যারা দুর্জয়কে জয় করে ঘ. যারা প্রতিরোধকে অস্বীকার করে

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. সুফিয়া কামাল ২. গ. যে যাত্রা করে ৩. ঘ. ঝলমল
৪. গ. যারা দুর্জয়কে জয় করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অভিযাত্রিক কারা? কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন কেন?
২. অভিযাত্রিক কবিতাটির মূলবক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মহাকাল কাদের পরিচয় লিখে রাখে? কেন?
২. অভিযাত্রিকের বৈশিষ্ট্য কী?
৩. উষর প্রান্তরকে উর্বর করে কে? তরুণ অভিযাত্রিকের সঙ্গে তার মিল কোথায়?

গ. ব্যাখ্যা

১. সেই তো জীবন, জয় গৌরবে হেসে ওঠে ঝলমল।
২. ফুল ফসলেতে ভরা
এই স্বাক্ষর তরুণ প্রাণের অরুণ রক্তক্ষরা।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : অভিযাত্রিক কারা? কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন কেন?

উত্তর : 'অভিযাত্রিক' কবিতাটির কবি বেগম সুফিয়া কামাল। এ কবিতায় কবি অভিযাত্রিকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। কবির ভাষায় অভিযাত্রিক হচ্ছে তারাই, যারা বয়সে নবীন ও দুর্জয়কে জয় করাই যাদের জীবনের কামনা।

অভিযাত্রিকরা চিরকাল দুর্গম পথে পাড়ি দেয়। যেখানে বাধা প্রতিবন্ধকতা সেখানেই তারুণ্যের পথ চলার আনন্দ বেশি। দুর্জয়কে তারা চিরকাল জয় করে। তাই তো মহাকাল শুধু তাদেরই মনে রাখে যাদের আছে তারুণ্য - যারা অজেয়কে জয় করে। যে পথ বন্ধুর সেই পথই একদিন শতদল বিস্তার করে তরুণ অভিযাত্রিককে অভিনন্দিত করে।

ঝড়ের রাতে, বৈশাখের তপ্ত, তীক্ষ্ণ রোদে, বর্ষার দুর্দিনে কোথাও অভিযাত্রিকের পথ চলা বন্ধ থাকে না। পথ চলতে ভুল হয় - কখনও ভ্রান্তি এসে পথরোধ করে। কিন্তু অভিযাত্রিক কখনও পরাজিত হয় না। ভুলকে শুধরে নিয়ে আবার পথ চলে। তরুণের তাজা প্রাণ কখনও হার মানে না। অভিযাত্রিক চিরকাল মুক্তির দিশারী। মুক্তির পথকে অহোরাত্র তারা খুঁজে ফিরে। প্রাণের শিখার দীপ্তিতে উজ্জ্বল এ তরুণদের কাছে মহাকালও বুঝি হার মানে। নদী যেমন পথুরে পথ অতিক্রম করে দু তীরে ঊষর মরুভূমিকে উর্বর করে সাগরের সন্ধানে চলে যায় তেমনি অভিযাত্রিক দল আনন্দের ঝরণা ধারায় প্লাবিত সমাজ-সংসার। অরুণ প্রাতের তরুণ দল এমনি করে চিরকাল পূর্বদিগন্তের সূচনা করে।

তরুণ অভিযাত্রিকের পথচলার, অজেয়কে জয় করার, মানবের মঙ্গল করার সাধনার জন্য তাদেরকে কবি আহ্বান করেছেন। তারাই পৃথিবীতে আনতে পারে নতুন আলো - গাইতে পারে সাম্যের গান - করতে পারে মঙ্গলের আরাধনা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : মহাকাল কাদের পরিচয় লিখে রাখে? কেন?

উত্তর : মহাকাল আদি ও অন্ত্যহীন বহমান সময়ের ধারা। মহাকালে সবকিছু লুপ্ত হয় - মিশে যায় মহা অন্ধকারে। তবু মহাকালের স্মৃতিতে কিছু কিছু মানুষের কথা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মহাকালের পাতায় যাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে তারা বয়সে নবীন, প্রাণ-প্রাচুর্য ও তারুণ্যে ভরপুর। যারা, দুর্গম, বন্ধুর পথে চলতে ভালবাসে - দুর্জয়কে যারা জয় করে তাদেরই কথা মহাকাল লিখে রাখে। সকল গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর অন্ধকার থেকে মানব সমাজ মুক্তি পেতে চায়। আর এ মুক্তি নিয়ে আসতে পারে অরুণ প্রাতের তরুণদল। মহাকাল এদের কথাই চিরকাল স্মরণে রাখে।

প্রশ্ন ১ : উষর প্রান্তরকে উর্বর করে কে? তরুণ অভিযাত্রিকের সঙ্গে তার মিল কোথায়?

উত্তর : উষর অর্থাৎ অনুর্বর প্রান্তরকে উর্বর করে নদী। কঠিন পাষাণের হৃদয়ে যে জলধারার জন্ম, তা পাথুরে পথ বেয়ে এঁকেবেঁকে নিচে নেমে আসে। পথের প্রান্তরে তার দেখা হয় কত অনুর্বর, মরুভূমি, রুক্ষ, শুষ্ক প্রান্তরের সঙ্গে। এদের সবাইকে জলে সিক্ত করে নদী। পানির স্পর্শে শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে রুক্ষ পাথুরে জমি, মরু প্রান্তর। উষর প্রান্তরকে চিরকাল নদী এমন করেই উর্বর করে।

নদীর মতই তরুণ অভিযাত্রিকেরা চিরকাল পথ চলে। নবী যেমন পথের দুর্গমতার জন্য চলা বন্ধ করে না- অভিযাত্রীরাও তেমনি। অভিযাত্রিকের চলার উদ্দেশ্য জীবনের সম্ভারকে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা। নদী যেমন তার দুই তীরকে শ্যামল-স্নিগ্ধ করে। অভিযাত্রিক মানুষের চলার পথকে করে মসৃণ, অনাগত ভবিষ্যতকে করে সমৃদ্ধ।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. সেই তো জীবন, জয় গৌরবে হেসে ওঠে ঝলমল।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'অভিযাত্রিক' নামক কবিতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে জীবনের প্রকৃত পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে।

জীবনের সার্থকতা বা পূর্ণতা কোথায় - এ নিয়ে মানুষ চিরকাল ভেবেছে। কবির ভাষায় যে জীবন গৌরবের সে জীবনই সার্থক। যারা মানুষের জন্য, সভ্যতা, সমাজের জন্য চিরকাল কাজ করে যায় তাদের জীবনই মহীয়ান। ছকবাঁধা জীবনে বৈচিত্র্য নেই। দুর্গম পথকে যারা তুচ্ছ করে সে পথে এগিয়ে যায়, যারা দুর্জয়কে জয় করে অসামান্য শক্তি দিয়ে তাদের জীবনই সার্থক। দুর্গম বন্ধুর পথের যাত্রীদের পদতলে কণ্টক একদিন আনন্দের শতদল হয়ে ফুটে ওঠে। এই যাত্রীদের জীবনকেই কবি ধন্য মেনেছেন। এ জীবনই জয়ের গৌরবে চির অম্লান।

জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি নির্ণয়ে লেখক সহজভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

p¡a p¡N-II j¡¢T
gll¦M A¡qjc

লেখক পরিচিতি

১৯১৮ সালের ১০ই জুন ফররুখ আহমদ যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৩৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। তিনি কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এবং সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। কর্মজীবনে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের স্টাফ রাইটার ছিলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন।

ইসলামের আদর্শ তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজুম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (কাব্য নাঁ্য-১৯৬১), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), হাতেম তায়ী (১৯৬৬)। তিনি কিছু শিশুতোষ রচনাও লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে : পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯) প্রধান।

১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। ফররুখ আহমদ ইসলামি ঐতিহ্য ও পুনর্জাগরণের কবি। এ কবিতাতেও কবি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- সাত সাগরের মাঝিকে আহ্বানের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা।
নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু, তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
তবু তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা

এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু, তুমি জাগলে না?
দুয়ারে সাপের গর্জন শোনো নাকি?
কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়,
হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো,
নইলে যে-সব ভেঙে হবে চৌচির।

তুমি দেখছ না, এরা চলে কোন আলেয়ার পিছে পিছে?
চলে ক্রমাগত পথ ছেড়ে আরও নিচে!
হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভে নি একথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখেছে এ মরুভূমি,
দেখো জমা হল লালা রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে!
তোমার জাহাজ হয়েছে কি বানচাল,
মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল?
তাই কি অচল জাহাজের ভাঙা হাল
তাই কি কাঁপছে সমুদ্র ক্ষুধাতুর
বাতাস কাঁপানো তোমার ও ফাঁকা পাল?
জানি না, তবুও ডাকছি তোমাকে সাত দরিয়ার মাঝি,
প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে উঠেছে বাজি?

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

তসবির – ছবি, **কিশতি** – নৌকা, **সেতারা** – তারা।

কাহিনী সংক্ষেপ

আঁধার পার হয়ে সূর্য উঠেছে। নারঙ্গি বনে পাতা কাঁপছে- সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। তবু সাত সাগরের মাঝির নিদ্রা এখনও ভাঙ্গে নি। কবি কাতর আহ্বান জানিয়েছেন মাঝিকে। মাঝি আসলেই কিশতি আবার চলবে শুরু করবে দূর বন্দরের দিকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি কার রচনা?
   ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ফররুখ আহমদ
   গ. তালিম হোসেন ঘ. জসীম উদ্দিন

২. ফররুখ আহমদের কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা কী?
   ক. সাম্য ও মৈত্রী খ. পার্থিব জীবন
   গ. ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য ঘ. দুঃস্থ মানব-মানবী

৩. 'তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না' - কাকে বলা হয়েছে?
   ক. সাত সাগরের মাঝিকে খ. মাঝি মাল্লার দলকে
   গ. ঘুমন্ত জাতিকে ঘ. পুত্রকে

৪. সকালে কোন ফুল ঝরেছে?
ক. বকুল খ. শেফালি
গ. লবঙ্গ ঘ. হাসনাহেনা

৫. 'মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল' এখানে সেতারা বলতে কি বোঝান হয়েছে?
ক. আলোক স্তম্ভ খ. দিক-নির্দেশক
গ. উজ্জ্বল তারকা ঘ. ধর্মীয় নেতৃত্ব

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. ফররুখ আহমদ ২. গ. ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য
৩. ক. সাত সাগরের মাঝিকে ৪. ঘ. হাসনাহেনা ৫. খ. দিক-নির্দেশক

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কবির আশঙ্কার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এ ঘুমে তোমার মাঝিমাল্লার ধৈর্য নেইকো আর,
সাত সমুদ্র নীল আকাশে তোলে বিষ ফেনভার,
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে আকাশের পথ ধরে
নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
বেসাতি তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে?
ঘুমঘোরে তুমি শুনছ কেবল দুঃস্বপ্নের গাঁথা।

উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটে নি কি সব দেনা?
সকাল হয়েছে। তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাঁ চুমি
পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গুলে বকাওলি?
ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে,
ভুলেছ কি সেই জমরুদ তোলা স্বপ্ন সবার চোখে
ঝলসে চন্দ্রালোকে,
পাল তুলে কোথা জাহাজ চলেছে কেটে কেটে নোনা পানি,
অশ্রান্ত সন্ধানী।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

বানচাল – ব্যর্থ, **দরিয়া** – নদী, সমুদ্র।

কাহিনী সংক্ষেপ

মেঘ কি সেতারাকে আড়াল করেছে। যার জন্য জাহাজের হাল ভাঙ্গা - পাল উড়ে না। তোমার দীর্ঘ ঘুমে মাঝিমাল্লাদের আর ধৈর্য নেই। সাত সাগরের মাঝি তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচ আর জাফরানের স্মৃতি। তুমি কি ভুলেছ জাহাজের নোনা পানি কেটে চলার অশ্রান্ত সন্ধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ক্ষুধাতুর কে?
   ক. সমুদ্র — খ. নদী
   গ. মাঝিমাল্লা — ঘ. জনসাধারণ
২. মাঝিমাল্লার কিসে আর ধৈর্য নেই?
   ক. এই অবসরে — খ. এই সাধারণ
   গ. এই ঘুমে — ঘ. এই শ্রান্তিতে
৩. ঘুম ঘোরে সাত সাগরের মাঝি কী শুনছে?
   ক. বিরহের কাহিনী — খ. দুঃস্বপ্নের গাথা
   গ. সমুদ্র ভ্রমণের কথা — ঘ. এলাচ বনের কাহিনী

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ক. সমুদ্র ২. গ. এই ঘুমে ৩. খ. দুঃস্বপ্নের গাথা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার ভাবার্থ লিখুন।
২. সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় জাতীয় জীবনের নবচেতনার যে কথা বলা হয়েছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সাত সাগরের মাঝি কে?
২. সাত সাগরের মাঝি জাতীয় জীবনে কি অবদান রাখবে?
৩. তুমি মিনতি আমার রাখো' - কাকে কি মিনতি করা হয়েছে?

গ. ব্যাখ্যা

১. কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
   এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তবু, তুমি জাগলে না?
২. ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
   অজানা ফুলের দেশে . . . .।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার ভাবার্থ লিখুন।

উত্তর : কবি ফররুখ আহমদ ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী একজন শক্তিমান কবি। তাঁর আলোচ্য কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটিও সেই আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রেরণা সঞ্জাত একটি কবিতা।

'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় সাধারণ যে অর্থ পাওয়া যায় তা হচ্ছে- সাত সাগরের মাঝিকে কবি আহ্বান করছেন। কিন্তু সাদামাঠা এ অর্থই কবিতার একমাত্র অর্থ নয়। সমগ্র মুসলিম জাতি আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন ইসলামের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বিশ্বে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিই শুধু নয় - ধনে, সম্পদে, ঐশ্বর্যে ও সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম জাতি ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু মুসলিমদের সে স্বর্ণযুগ আজ আর নেই। হতাশা ও অন্ধকার মুসলিম জাতিকে গ্রাস করেছে। আলস্য, জড়তা, উদ্যোগহীনতা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সমাজ জাগরণে বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহমদ 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় সমাজকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য সাত সাগরের মাঝিকে নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানিয়েছেন। বিজয়ীর বেশে একদিন বন্দর থেকে বন্দরে মুসলমানরা নির্ভয়ে বিচরণ করেছে। সমাজের অগ্রগণ্য অংশের প্রতিনিধি সাত সাগরের মাঝি। তাকেই কবি নেতৃত্ব দানে আহ্বান জানিয়েছেন।

পৃথিবীতে আজ নবজাগরণের পালা চলছে। তাতে মুসলমানদের সামিল হতে হবে। অন্ধকার কেটে নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। নারঙ্গী বাতাসের ছোঁয়া লেগেছে। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। ভাঙা হাল আর ছেঁড়াপাল সম্বল করেই বেরিয়ে যেতে হবে। কারণ জনতা উন্মুখ হয়ে আছে যাত্রার জন্য। অতীতের স্মৃতি-স্বপ্নকে মনে রেখেই সাত সাগরের মাঝিকে চলে যেতে হবে নতুন নতুন বন্দরে।

'সাত সাগরের মাঝি' জাগরণ ও উদ্দীপনামূলক কবিতা। এ কবিতার মূল কথা সমাজকে জাগাতে হবে। আর এজন্য জাতির কর্ণধারকে হাল ধরতে হবে দৃঢ় হাতে।

প্রশ্ন ২ : 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় জাতীয় জীবনের নবচেতনার যে কথা বলা হয়েছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : 'সাত সাগরের মাঝি' ইসলামি ঐতিহ্য সচেতন ফররুখ আহমদের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ কবিতায় কবি জাতীয় নবচেতনার কথা বলেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' হচ্ছে জাতীয় মুক্তির কর্ণধার। তিনি জাতিকে নিয়ে যাবেন তার লক্ষে। মুসলিম জাতি আজ চরম হতাশা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত। তার অতীত আজ স্মৃতি মাত্র। তবে জাতীয় নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। মানুষ মুক্তি চায় হতাশা থেকে অন্ধকার থেকে। নারঙ্গি বনে সবুজ পাতা কাঁপছে। সাগরের জোয়ার এসেছে। সকালের হাসনাহেনা কখন ঝরে গেছে। ক্ষুধিত মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লারা দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অথচ এখনও জাতির কর্ণধার হিসেবে কারও আগমন ঘটেনি। সাত সাগরের মাঝি হচ্ছে সেই কর্ণধার। জাতিকে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। সাত সমুদ্রের বন্দরে-বন্দরে তার জাহাজ ভিড়বে। বাণিজ্য-বেসাতি করে, সমুদ্রের মণি-মুক্তা আহরণ করে তিনি আনবেন। জাতি পাবে সমৃদ্ধি। মুক্তি ঘটবে স্থবিরতা থেকে। সেজন্যই কবি কর্ণধার অর্থাৎ সাত সাগরের মাঝিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রথম সফরের অভিজ্ঞতা। কবি বলেছেন-

"ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে
ভুলেছে কি সেই জমরুদ তোলা স্বপ্ন সবার চোখে
ঝলসে চন্দ্রালোকে।"

অতীতের এই স্মৃতিই হতে পারে ভবিষ্যতের চালিকা শক্তি। তাই সাত সাগরের মাঝিকে সে কথা স্মরণ রেখে সমগ্র জাতিকে নেতৃত্বদানের আহ্বান জানিয়েছেন কবি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : সাত সাগরের মাঝি কে?

উত্তর : কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি প্রকৃতপক্ষে দেশ ও জাতির কর্ণধার। সাত সাগরের মাঝি তার জাহাজ নিয়ে বিক্ষুব্ধ ও বৈরী সমুদ্র পার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সমস্যা সঙ্কুল এ সময়ে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে কর্ণধার জাতিকে পৌঁছে দেবে সাফল্যের প্রান্তে। সাত সাগরের মাঝি বা কর্ণধার এক কল্পিত নেতা - যার দায়িত্ব হচ্ছে দেশ ও সমাজের মুক্তি।

প্রশ্ন : 'তুমি মিনতি আমার রাখো' কাকে কি মিনতি করা হয়েছে?

উত্তরঃ কবি ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা থেকে 'তুমি মিনতি আমারা রাখো' চরণটি উদ্ধৃত হয়েছে। বাক্যটি মিনতি বা অনুরোধের। কবি মিনতি জানিয়েছেন সাত সাগরের মাঝিকে।
সাত সাগরের মাঝি কবির কল্পিত জাতীয় কর্ণধার বা নেতৃত্ব। কবি তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন জাতিকে হতাশা ও অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে। নতুন সূর্যোদয় হয়েছে, সমুদ্রে এসেছে জোয়ার মাঝি-মাল্লারা সমুদ্রযাত্রার জন্য অধীর। কিন্তু সাত সাগরের মাঝির ঘুম এখনও ভাঙেনি। তাই ঘুম থেকে জেগে নাবিককে জাহাজ ভাসাতে বলেছেন কবি। জাতিকে আলোর পথে, উন্নতির পথে নিয়ে যাবার জন্য পথ নির্দেশককে কবি মিনতি জানিয়েছেন।

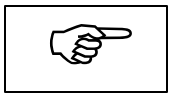

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন

২. ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর ..... ফুলের দেশে।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি প্রথম সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।
ইসলামি ঐতিহ্যের কবি ফররুখ আহমদ আলোচ্য কবিতায় সাত সাগরের মাঝিকে জাতির কর্ণধাররূপে আহ্বান করেছেন। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে, সূর্যোদয় হয়েছে, মাঝি-মালার তৈরি তবু সাত সাগরের মাঝির ঘুম ভাঙেনি। হয়তো এখনও রাতের দুঃস্বপ্নের ঘোর চোখ থেকে চলে যায়নি। এই সাত সাগরের মাঝিকে উদ্দীপ্ত করতে ও নেতৃত্ব গ্রহণ করতে কবি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রথম সফরের অভিজ্ঞতা।
প্রথম সফরে সাত সাগরের মাঝি সমুদ্রকে জয় করে বন্দর থেকে বন্দরে ফিরেছে। অজানা-অচেনা দেশে যেয়ে পৌঁছেছে। নানা দেশে নানা জনপদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আহরণ করেছে ধন-সম্পদ। কবি সেই প্রথম সফরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে বলেছেন।
প্রকৃতপক্ষে প্রথম সফরের অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কবি সাত সাগরের মাঝিকে উদ্দীপ্ত ও কর্মচঞ্চল করতে আগ্রহী হয়েছে।

fh¡n¡l A¡-m¡
A¡qp¡e q¡h£h

লেখক পরিচিতি

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। দৈনিক বাংলায় সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলো হচ্ছে:

কাব্য : রাত্রিশেষ (১৯৪৬), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), প্রেমের কবিতা (১৯৮২)।

উপন্যাস : অরণ্য নীলিমা (১৯৬২)।

শিশু কিশোর রচনা : জোছনা রাতের স্বপ্ন, রানী খালের সাঁকো।

১৯৮৫ সালে আহসান হাবীব মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'পূর্বাশার আলো' কবিতাটি কবির 'সারা দুপুর' কাব্য গ্রন্থের 'আলো আঁধারের দর্শন' কবিতার অংশবিশেষ। এ কবিতায় কবি দুরন্ত অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- আলোক অভিসারী যাত্রীদের সঙ্গে ভীরু মানুষের দ্বন্দ্বের চিত্রটি অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ওরা এখন পার হতে চায় দুর্গম দীর্ঘ পথ,
শোনো ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এল!
পূর্বাশার আলো ঐ দেখা যায়!

আমরা বলি, আহা অবুঝ ওরা বোঝে না।
ওদের ফিরিয়ে দাও তুমি,
ফিরিয়ে দাও আমাদের বাহুবন্ধনে-
সামনে ওদের কী গভীর অন্ধকার!
ওদের অপরাধ তুমি নিও না।

ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এল আমাদের পেছনে
আমরা বলি, সামনে তোমাদের রাত নামছে
তোমরা ফিরে এসো।

আশা-সে ত মরীচিকা, আমরা বলি।
ওরা বলে, আশাই জীবন, জীবনের শ্রী।

ওরা এগিয়ে যায় স্বচ্ছন্দে,
আমরা অবাক হই।

তুষার শীতল এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে
আমরা একটি ছোট্ট প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে ব্যর্থ হই,
বলি, এই অন্ধকারের দর্শন তোমরা জানো না।

দূরে ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়;
আলো এত আলো!
এই তো জীবনের দার্শনিক ভাষ্য!

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

পূর্বাশা – পূর্বদিক, **প্রকোষ্ঠ** – কক্ষ, **শ্রী** – সৌন্দর্য্য, **ভাষ্য** - ব্যাখ্যা, **আশাই জীবন** - জীবন সংগ্রামশীল।

কাহিনী সংক্ষেপ

আলোকের অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলে দুর্গম পথকে পদদলিত করে। ভীরুদের দল তাদের বারণ করে। দুর্গম পথের ভয়, অন্ধকারের ভয় দেখায় তারা। তারা বলে আশা - সে তো মরীচিকা। তবু অভিযাত্রী দল থেমে থাকে না। যেখানে ভীরুর দল হিম-শীতল প্রকোষ্ঠে একটি প্রদীপও জ্বালিতে ব্যর্থ হয় - সেখানে আলোর রাজ্যে যেয়ে পৌঁছাতে পারে অভিযাত্রী দল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'পূর্বাশার আলো' কবিতাটি কার রচনা?
   ক. সুফিয়া কামাল — খ. আহসান হাবীব
   গ. আবুল হোসেন — ঘ. আল মাহমুদ

২. পূর্বাশা বলতে কী বোঝায়?
   ক. সূর্যরশ্মি — খ. পূর্বদিক
   গ. পূর্ব-আলো — ঘ. প্রভাত

৩. কোনটি আহসান হাবীব রচিত কাব্য?
   ক. বিধ্বস্ত নীলিমা — খ. পদাতিক
   গ. সারা দুপুর — ঘ. নকশী কাঁথার মাঠ

৪. 'ওরা বলে, ---------- জীবন, জীবনের শ্রী'। শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে?
   ক. আশাই — খ. ভাষাই
   গ. প্রেমই — ঘ. চাওয়াই

৫. একটি ছোঁ প্রদীপ জ্বালাতে কারা ব্যর্থ হয়?
   ক. অভিযাত্রীরা — খ. স্বপ্নচারীরা
   গ. কাব্য রচয়িতারা — ঘ. ভীরুরা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. আহসান হাবীব ২. খ. পূর্বদিক ৩. গ. সারা দুপুর
৪. ক. আশাই ৫. ঘ. ভীরুরা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আলোক অভিযাত্রীরা কোথায় যেতে চায়? কারা বাধার সৃষ্টি করে? অভিযাত্রীরা কি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।
২. 'পূর্বাশার আলো' কবিতাটির মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্বাশার আলো কী?
২. 'আশা সে তো মরীচিকা' - কে, কেন বলেছে?
৩. আলো এত আলো এত আলো কোথায়? কে বলেছে?

গ. ব্যাখ্যা

১. আশা সে তো মরীচিকা, আমরা বলি।
ওরা বলে, আশাই জীবন, জীবনের শ্রী।
২. আলো এত আলো!
এই তো জীবনের দার্শনিক ভাষ্য।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : আলোক অভিযাত্রীরা কোথায় যেতে চায়? কারা বাধার সৃষ্টি করে? অভিযাত্রীরা কি লক্ষে পৌঁছাতে পারে?

উত্তর : কবি আহসান হাবীব তাঁর 'পূর্বাশার আলো' কবিতায় জীবনের কিছু উপলব্ধির কথা বলছেন। পৃথিবীতে একদল মানুষ আছেন, যাঁরা কর্মী। তাঁরা কোন কিছুকে ভয় করেন না। দুর্গম পথে তাঁরা চলতে ভালবাসেন। অজেয়কে জয় করার বাসনা তাদের মনে। কিন্তু ভীরুর দল চিরকাল অন্ধকারের কারাগারে থাকতে ভালবাসে। অভিযাত্রীদের তারা দুর্গম পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চায়। বলে বিপদের কথা, ভয়ের কথা, রাতের কথা। কিন্তু অভিযাত্রীরা পূর্বাশার আলো দেখে উদীপ্ত হয়। পূর্বাশার আলো তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। অদৃশ্য আশা নিয়ে তারা বেরিয়ে যায় আলোর সন্ধানে। ভীরুরা বলে আশা - সে তো মরীচিকা মাত্র। মরীচিকার পিছনে ছোঁা মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। কিন্তু অভিযাত্রীরা বলে আশাই জীবন - আশাতেই জীবনের শ্রী ও সৌন্দর্য।

ভীরুরা হিমশীতল প্রকোষ্ঠে একটি ছোঁ আলোর প্রদীপও জ্বালাতে পারে না। তাই অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্ধকারের দর্শন আওড়ায়।

ভীরুদের দলকে পিছনে ফেলে অভিযাত্রীরা ঠিকই পৌঁছে যায় আলোর দেশে। দূর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় - আলো এত আলো। অভিযাত্রীরা আলোর রাজ্যে পৌঁছে যায়।

'পূর্বাশার আলো' কবিতায় কবি অভিযাত্রীদের চোখে দেখেছেন জীবনের বিকাশ। যারা ভীরু তারা অন্ধকারের অধিবাসী। জীবনের সৌন্দর্য তাদের কাছে ধরা দেয় না। কবি অভিযাত্রী ও ভীরুদের মানস বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিচারে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : পূর্বাশার আলো কী?

উত্তর : 'পূর্বাশার আলো' শব্দ দুটির অর্থ পূর্বদিকের আলো। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। তাই সকালের প্রথম আলো পূর্বদিকেই দেখা যায়। সেদিক থেকে বলা যায়, সকালে উদিত সূর্যের আলোকেই বলা যায় পূর্বাশার আলো।

পূর্বাশার আলো একটি ভাবার্থও অনুভব করা যায়। পূর্বদিকে সকালের আলো প্রকাশিত হলে মানুষের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। মানুষ তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ শুরু করে। অন্ধকার রাত্রি থেকে মুক্তি পায়। এদিক থেকে পূর্বাশার আলোকে মুক্তির আলোও বলা যায়।

প্রশ্ন ২ : আশা সে তো মরীচিকা' কে, কেন বলেছে?

উত্তর : উদ্ধৃত চরণটি আহসান হাবীব রচিত 'আশা সে তো মরীচিকা' কথাটি বলেছে জীবন পরিবর্তনে অনিচ্ছুক ভীরুর দল। অভিযাত্রী দল আলো সন্ধানী। তারা আশাবাদী। কিন্তু ভীরুর দল নৈরাজ্যবাদী। তারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মানতে চায় না। আশাকে তারা বলে মরীচিকা। মরুভূমিতে মরীচিকা মিথ্যা আশা দেয় ও হতভাগ্য পথিককে বঞ্চিত করে। ভীরুরা একথা বলে অভিযাত্রীদের পথ রুদ্ধ করতে চায়।

ব্যাখ্যা উত্তর

২. আলো এত আলো!
এই তো জীবনের দার্শনিক ভাষ্য!

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি আহসান হাবীব রচিত 'পূর্বাশার আলো' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে মানব জীবন দর্শনের কথা বলা হয়েছে।

অন্যকে নিয়ে মানুষ যা ভেবেছে নিজের জীবন নিয়ে মানুষ ভেবেছে তার বহুগুণ বেশি। জীবন কেন? জীবনের ভাষ্য কী, জীবনের তাৎপর্য কী? এসবই ভাবনার মূল কেন্দ্র। বিভিন্ন চিন্তাবিদ, দার্শনিক মানুষের জীবনের নানা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সহজভাবে যেটি বোঝা যায় - প্রাণধারণই মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য। যেখানে আলো সেখানে জীবন সুন্দর। যেখানে অন্ধকার, সেখানে কুসংস্কার, সেখানে কুশ্রীতা। তাই দুর্গম পথের অভিযাত্রীরা সুন্দরের এবং আলোর সন্ধানী। তাই কবি বলতে চেয়েছেন আলোর প্রাচুর্যই জীবনের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। আমাদের জীবনের জন্য চাই আলো, আলো এবং আরও আলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

cj l
pLi¿ i–¡Q¡k

লেখক পরিচিতি

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সুকান্ত ভট্টাচার্য কলকাতার কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস কোটালীপাড়া, ফরিদপুর। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও ধ্বংসলীলা সুকান্তকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অনাচার, শোষকের নির্যাতন কবিকে বিক্ষুব্ধ করে। তিনি তাঁর কবিতায় গণমানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ও শোষকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রধান কাব্যগ্রন্থ : ছাড়পত্র (১৯৪৯), ঘুম নেই (১৯৪৮), অভিযান (১৯৫৩, পূর্বাভাস (১৯৫৫) ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে একুশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে গণজাগরণের একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

হয় ধান নয় প্রাণ - এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।
সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্ত রঙিন ধান
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

দুর্মর - যা সহজে সরে না, কঠিন প্রান, **উচ্ছাস** - প্রবল ভাবাবেগ, **উদ্দেশ্য** - সন্ধান, খোঁজ।

কাহিনী সংক্ষেপ

হিমালয় থেকে সুন্দরবন সমগ্র দেশ জেগে উঠেছে। বাংলাদেশ তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শোষণ ও শাসন দিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। বাংলাদেশের মহাজাগরণে পৃথিবী আজ বিস্মিত। জ্বলে পুড়ে ছারখার হলেও অত্যাচারীর কাছে বাংলাদেশ আর মাথা নোয়াবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. দুর্মর কবিতাটির কবি কে?
   ক. কাজী নজরুল ইসলাম — খ. বুদ্ধদেব বসু
   গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য — ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

২. কোনটি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত কাব্যগ্রন্থ?
   ক. রানার — খ. ছাড়পত্র
   গ. অগ্নিবীণা — ঘ. রূপসী বাংলা

৩. 'দুর্মর' শব্দের অর্থ কী?
   ক. যা মরেও মরে না — খ. যা সহজে মরে না
   গ. যা দেরিতে মরে — ঘ. যা তাড়াতাড়ি মরে যায়

৪. 'নিরীহ মাটি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
   ক. বাংলাদেশের উর্বর মাটি — খ. বাংলাদেশের সমতল ভূমি
   গ. বাংলাদেশের নিরীহ চাষী — ঘ. বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের কোমল প্রকৃতি

৫. দুর্মর কবিতার মূল বিষয় কী?
   ক. অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ — খ. শ্রমিকের প্রতিবাদ
   গ. অসচেতন চিন্তা — ঘ. বাউল চেতনা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১। গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ২. খ. ছাড়পত্র ৩. খ. যা সহজে মরে না
৪. ঘ. বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের কোমল প্রকৃতি ৫. অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

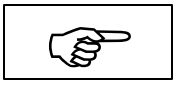

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দুর্মর কবিতাটিতে লেখক কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে লিখুন।
২. 'দুর্মর' কবিতা অবলম্বনে বাংলাদেশে নবজাগরণের চিত্র অঙ্কন করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'রক্তে রঙিন ধান' - এ কথার অর্থ কী?
২. সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে অভিনন্দিত করছে কেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।
২. দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'দুর্মর' কবিতাটিতে লেখক কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : সমগ্র বাংলাদেশ আজ জেগে উঠেছে। বাংলাদেশের জাগ্রত মানুষ আজ ভীত নয়। বাংলাদেশের নিরীহ মাটির কোমল প্রাণের মানুষেরা আজ দৃঢ়চিত্ত। কোন অন্যায় শাসন ও শোষণকে তারা মেনে নেয় না। ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রাণ জেগে উঠেছে। খরা-বন্যায় অত্যাচারে-অনাচারে জর্জরিত তবু বাংলাদেশের মাথা আর কেউ নোয়াতে পারবে না।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : "রক্ত রঙিন ধান" এ কথার অর্থ কী?

উত্তর : কবি সুকান্ত ভট্টাকার্যের 'দুর্মর' কবিতার একটি চরণের অংশে বলেছেন রক্তে রঙিন ধান। পাকা ধানের স্বাভাবিক রং সোনালি। কিন্তু কবির চোখে এ ধান রক্ত রঙিন। বহু কষ্টে ও শ্রমে কৃষক ফসল ফলায়। কিন্তু অত্যাচারী শোষক কৃষককে বঞ্চিত করে নিজের গোলায় নিয়ে যায়। হতভাগ্য কৃষক তার শ্রমের ফসল না পেয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে জীবন যাপন করে। কিন্তু এখন বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। এত সহজে কৃষক শোষকের কাছে পরাজিত হবে না। দরকার হলে রক্ত দিয়ে এ ধান রক্ষা করবে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ক্ষুধার অন্ন কিছুতেই শোষককে নিতে দেবে না। তাই কবি এ ধানকে বলেছেন রক্তের অর্জন বা ভাষান্তরে রক্ত রঙিন ধান।

প্রশ্ন ২ : সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে অভিনন্দিত করবে কেন?

উত্তরঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'দুর্মর' কবিতায় বাংলাদেশের মানুষের সাহসের প্রশংসা করেছেন। শোষকের নির্যাতনে তারা আর ভীত নয়। সমগ্র দেশের নির্যাতিত, লাঞ্ছিত জনতা জেগেছে। নিজের অধিকারকে তারা প্রতিষ্ঠিত করবেই। ধ্বংস ও মৃত্যুকে দেখে দেখে তাদের আর ভয় নেই। নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করে শ্রমের ফসল, ন্যায্য অধিকারকে তার বুঝে নিতে

চায়। এই অনমনীয় সংকল্পে স্থির বাংলাদেশের মানুষকে আজ অভিনন্দন জানাচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। তাদের সবার কণ্ঠে হচ্ছে "সাবাস বাংলাদেশ।"

ব্যাখ্যা উত্তর

২. দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'দুর্মর' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার কথা বলা হয়েছে।
বাংলাদেশের কৃষক চিরকাল বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে।

এখন গণসচেতনতার ঢেউ এসেছে। মানুষ আর বিনা প্রতিরোধে কোন কিছু মেনে নিতে রাজি নয়। বুকের রক্ত দিয়ে কৃষক তার ন্যায্য পাওনা রক্ষা করবে। ধান আর শোষকের গোলায় উঠবে না। অবাক পৃথিবী দেখবে বাংলাদেশের মানুষ আর জীবন্মৃত নয় - কর্মচাঞ্চল্যে অধীর, সংগ্রামে বীর, অধিকার আদায়ে অবিচল। সংগ্রামের দৃপ্ত চেতনা প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে।
শোষকের বিরুদ্ধে গণ মানুষের কঠিন-কঠোর শপথের কথাই এখানে ধ্বনিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

ü¡d£ea¡ a¢j
n¡jpl l¡qj¡e

লেখক পরিচিতি

১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর শামসুর রাহমান ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পেশা সাংবাদিকতা। শামসুর রাহমানের কবিতায় ত্রিশোত্তর আধুনিক ধারার কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের নাগরিকতা, হতাশা, সংগ্রাম ইত্যাদি তাঁর কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শামসুর রাহমানের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে :

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬৬), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৭৫), নিজ বাসভূমে (১৯৭০), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২) দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে দাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২) ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর কিছু অনুবাদ কবিতা ও শিশুতোষ কবিতা রয়েছে। তিনি ১৭ আগষ্ট ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কবির "বন্দী শিবির" কাব্য গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কবির শৈশবের নদীর একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- তিতাস কেন কবির স্মৃতিতে উজ্জ্বল তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি

মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর।
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

অজর – যা জরাগ্রস্ত নয় বা যা চির নতুন হয়ে থাকে, **অবিনাশী** – যার বিনাশ বা ধ্বংস নেই, **পতাকা-শোভিত** – পতাকা দিয়ে সাজানো, **ঝাঁঝালো মিছিল** – বিক্ষুব্ধ মিছিল, **রোদেলা** – রোদ ঝলমলে, **গ্রন্থিল** – গ্রন্থিযুক্ত, **মুক্তিসেনা** – দেশের মুক্তির জন্য যে সেনা যুদ্ধ করে, **মেধাবী** – মেধা আছে যার, **ঝিলিক** – ক্ষণস্থায়ী আলো, **ঝলকানি** – তেজ, উত্তাপ, **ভাষণ** – কথা, বক্তৃতা, **সংলাপ** – আলাপ।

কাহিনী সংক্ষেপ

''স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এ কবিতায় কবির স্বাধীনতার প্রতি একান্ত আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানের বন্দী শিবির থেকে কবি স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেছেন বিভিন্ন উপমা ও চিত্রকল্পে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'স্বাধীনতা তুমি কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত?
   ক. নিজ বাসভূমে — খ. বন্দী শিবির থেকে
   গ. রৌদ্র করোটিতে — ঘ. দুঃসময়ের মুখোমুখি

২. স্বাধীনতা তুমি কবিতাটি কার রচনা?
   ক. নজরুল ইসলাম — খ. জীবনানন্দ দাশ
   গ. শামসুর রাহমান — ঘ. ফররুখ আহমদ

৩. 'ঝাকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ' কাকে বলা হয়েছে?
   ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত — খ. জীবনানন্দ দাশ
   গ. কাজী নজরুল ইসলামকে — ঘ. জসীম উদদীন

৪. স্বাধীনতাকে কিসের হাসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
   ক. অবোধ শিশুর — খ. মায়ের
   গ. মুক্তিসেনার — ঘ. কৃষকের

৫. একুশে ফেব্রুয়ারির সভাকে কী বলা হয়েছে?
   ক. মহৎ — খ. উজ্জ্বল
   গ. প্রাণবন্ত — ঘ. উত্তম

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. বন্দী শিবির থেকে ২. গ. শামসুর রাহমানের
৩. গ. কাজী নজরুল ইসলামকে ৪. ঘ. কৃষকের ৫. খ. উজ্জ্বল

এক কথায়/বাক্যে উত্তর দিন

১. স্বাধীনতা তুমি কবিতাটি কে রচনা করেন?
২. শামসুর রাহমানের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
৩. কবিতাটিতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
৪. স্বাধীনতাকে রবিঠাকুরের কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
৫. স্বাধীনতাকে কার চোখের ঝিলিক বলা হয়েছে?

উত্তর

১. শামসুর রাহমান ২. রৌদ্র করোটিতে ৩. স্বাধীনতাকে
৪. অজর কবিতা অবিনাশী গান ৫. মুক্তি সেনার

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- স্বাধীনতা সম্পর্কে আরও কিছু উপলব্ধির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

স্বাধীনতা তুমি
কালবৈশাখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনা বুক
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাযের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হারের নম্র পাতায় মেহেদির রং।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিনির ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমল তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

অকূল – যার কূল নেই, **উদার** – যা সঙ্কীর্ণ নয়, মহৎ, **শুভ্র** – সাদা, **উদ্দাম** – বাধাহীন, প্রবল, **কোর্তা** – জামা, **বয়েসী** – যার বয়েস হয়েছে।

কাহিনী সংক্ষেপ

'কবি এখানে স্বাধীনতাকে তুলনা করেছেন তার যা একান্ত ও প্রিয় সব কিছুর সঙ্গে। শ্রাবণে মেঘনার বুক, মায়ের শাড়ির কাঁপন। পিতার জায়নামায খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা সবকিছুই কবির অনুভবে স্বাধীনতার উপলব্ধিতে পূর্ণ। স্বাধীনতার উপলব্ধি কেমন, পরাধীন দেশের কবি বিভিন্ন উপমায় অনুভব করার চেষ্টা করেছেন।

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন-

১. কবি স্বাধীনতাকে বলেছেন মেঘনার অকূল বুক।
২. কবি পিতার কোর্তার উপমা ব্যবহার করেছেন।
৩. বন্ধুর হাতে রাঙা পোস্টারের উপমা কবি ব্যবহার করেছেন।
৪. স্বাধীনতাকে কোকিলের গান বলেছেন।
৫. কবি পরাধীনতাকে বলেছেন কবিতার খাতা।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. স ২. মি ৩. স ৪. স ৫. মি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতাকে কবি কিভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করুন।
২. স্বাধীনতা তুমি কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার। - কেন বলা হয়েছে?
২. 'স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাযের উদার জমিন' - এর অর্থ কী?

গ. ব্যাখ্যা

১. স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
২. স্বাধীনতা তুমি/শ্রাবণে অকুল মেঘনার বুক,
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাযের উদার জমিন।
৩. স্বাধীনতা তুমি,/বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা/ যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতাকে কবি কিভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ 'বন্দী শিবির' থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। সেদিন অবরুদ্ধ কবি স্বাধীনতাকে দেখেছিলেন - স্বাধীনতাকে উপলব্ধিতে এনেছিলেন তারই বর্ণনা আছে কবিতাটিতে। পরাধীন দেশে জীবনে এক বিরাঁ অংশ কবি কাটিয়েছেন। তাই যে স্বাধীনতা আসছে ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে সেই স্বাধীনতা কবি উপলব্ধি করেছেন নানা উপমা, চিত্রকল্প ও রূপকল্পে।

কবিতার শুরুতেই স্বাধীনতাকে কবি তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের অজর কবিতা অবিনাশী গানের সঙ্গে। তারপরই নজরুলকে স্মরণ করেছেন মহান পুরুষ হিসেবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দুই কবির অবদান অবিস্মরণীয়। বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের পথে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এক বিরাঁ মাইলফলক। একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা তাই কবির মনে এসেছে।
মাঠের ফসল দেখে কৃষকের মুখে যে অনাবিল হাসি ফোটে, রোদেলা দুপুরে গ্রাম্য পুকুরে বালিকার অবাধ সাঁতারের স্বাধীনতাকে কবি এক করে দেখেছেন। ছাত্র-শ্রমিকের আন্দোলন, মুক্তিযোদ্ধার দৃঢ় প্রত্যয় সব কিছুর মধ্যেই কবি স্বাধীনতার স্বপ্নকে দেখেছেন। মেঘনার প্রমত্ত বুক, পিতার জায়নামাযের অমলিন উদারতা, স্নেহময়ী মায়ের রূপ, শিশুর তুলতুলে গাল সবকিছুর মধ্যেই কবি স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কবিতার খাতা যেমন কবির কাছে সবচেয়ে প্রিয় - কবির কাছে স্বাধীনতাও তেমনি।
ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবি স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় তাই সাফল্যের সঙ্গে উপলব্ধিও করেছেন বিভিন্ন চিত্রকল্প ও উপমায়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : স্বাধীনতা তুমি/রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার। কেন বলা হয়েছে?

উত্তর : মুক্তির স্বাদ মানুষের চিরকাম্য। সমাজের গ্রামীণ পরিবেশে মেয়েদের নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। দুপুরে যখন পুরুষেরা মাঠে কর্মরত অথবা গৃহে বিশ্রামরত তখনই গ্রামীণ মেয়েদের একটু অবসর। জনহীন পুকুরে অবাধ সাঁতার দেবার সময় তখনই। গ্রাম্য মেয়েরা তখন মুক্তির আনন্দে মেতে ওঠে। বড় পরিসরে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কবি যে স্বাধীনতা চান তার স্বাদ কবি অনুভব করেছেন ছোঁ পরিসরের মুক্তি বা স্বাধীনতা দিয়ে।

ব্যাখ্যা উত্তর

৩. 'স্বাধীনতা তুমি, বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাম।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে স্বাধীনতাকে কবির কবিতার খাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
কবি অনুভব করেছিলেন- স্বাধীনতা আসছে। স্বাধীনতার আনন্দ যে তাই কবি নানাভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। কবির সবচেয়ে প্রিয় তার কবিতার খাতা। সেখানে কবির তার মনের ভাবনাগুলোকে ভাষা ও ছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার যে আনন্দ কবি তা কবিতার খাতাতেই অনুভব করেন। স্বাধীনতার আনন্দকে কবি সেই আনন্দের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। বর্ষার গাছের পাতার ফাঁকে ঝিলিমিলি, বাগানের মিষ্টি কলকাকলী সবই আনন্দ দেয়। তবে স্বাধীনতার মতো আনন্দদায়ক ধ্বনি ও শব্দ কবি কখনও শোনেনি।
স্বাধীনতার আনন্দকে কবি বয়েসী গাছের ফাঁকে আলোর ঝিলিমিলি, কবিতার খাতা এর অনুষঙ্গে এক করে নিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

¢aa¡p
A¡m j¡qjc

লেখক পরিচিতি

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আল মাহমুদ নামে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর প্রকৃত নাম মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ। তিনি দীর্ঘদিন সংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি শিল্পকলা একাডেমীতে যোগদান করেন ও পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি "দৈনিক গণকণ্ঠ" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

আল মাহমুদের কবিতায় আবহমান বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ :

লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, বখতিয়ারের ঘোড়া ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ : পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত ইত্যাদি।

উপন্যাস : যেভাবে বেড়ে উঠি উপমহাদেশে ইত্যাদি।

পাঠ পরিচিতি

'তিতাস' কবিতাটি কবির 'লোক লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। কবির স্মৃতিতে তিতাস নদীর বর্ণনা এখানে ফুটে উঠেছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কবির শৈশবের নদীর একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- তিতাস কেন কবির স্মৃতিতে উজ্জ্বল তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে। মাটির কলসে জল ভরে
ঘরে ফিরে সলিমের বউ তার ভিজে দুটি পায়।

অদূরের বিল থেকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক
পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায় দূরে;
জনপদে কী অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজি নি কিছুই।

কিছুই খুঁজি নি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।
একটি কাশের ফুল তারপর আঙুলে আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটি চলে গেছি। শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা,
সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস
কী গভীর জলধারা ছড়াল সে হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

প্রতীক – চিহ্ন, **প্রবাহ** – স্রোত, **মায়াবী** – মায়াযুক্ত, **শবরী** – শিকারী।

কাহিনী সংক্ষেপ

তিতাস কবির শৈশবের নদী। সারাদিন তীর ভাঙে, জলের ঘায়ে পাড় ভাঙে, যৌবনের প্রতীকের পালে ভর করে নৌকা ছুটে চলে। মানুষ আর প্রাকৃতিক পরিবেশে কবির মনে হয় এ মায়াবী নদী। নীরব তৃপ্তিতে কবি নদীর পাড়ে বসেছেন কতবার। নির্মল বাতাসে বুক ভরেছে। শহরের শেষ প্রান্তে নিজের ঘরে ফিরেও স্বপ্নের ভিতরে কবি এই তিতাস নদীকেই দেখেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক(✓)চিহ্ন দিন।

১. 'তিতাস' কবিতাটি কার রচনা?
   ক. আল মাহমুদ — খ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
   গ. শামসুর রাহমান — ঘ. মহাদেব সাহা

২. কোন কাব্যটি আল মাহমুদ রচিত?
   ক. বন্দী শিবির থেকে — খ. লোকলোকান্তর
   গ. বিপন্ন বিষাদ — ঘ. সারা দুপুর

৩. কবির কাছে এ নদী কোন সময়ের?
   ক. বৈশাখের — খ. রাত্রের
   গ. শৈশবের — ঘ. যৌবনের

৪. মায়াবী নদীটির নাম কি?
   ক. কপোতাক্ষ — খ. মহানন্দা
   গ. তিতাস — ঘ. পদ্মা

৫. 'যেখানে রেখেছি দেহ' কবি কোথায় দেহ রেখেছেন?
   ক. নবম বিছানায় — খ. নরম ঘাসে
   গ. তিতাসের পাড়ে — ঘ. গাছের ছায়ায়

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ক. আল মাহমুদ ২. খ. লোক লোকান্তর ৩. গ. শৈশবের ৪. গ. তিতাস ৫. গ. তিতাসের পাড়ে

খ. ১. আল মাহমুদ ২. তীর পাড় ভাঙ্গে ৩. পাখি ৪. মানুষের কোলাহল ও বিচিত্র কর্মপ্রবাহ ৫. শহরের শেষ প্রান্তে

খ. এক কথায়/বাক্যে উত্তর দিন

১. তিতাস কবিতাটির কবির নাম কি?
২. জলের প্রহারে সারাদিন কি ভাঙে?
৩. বিল থেকে কি উড়ে আসে?
৪. মায়াবতী নদী জনপদে কি এনেছে?
৫. কবির ঘর কোথায়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক) রচনামূলক প্রশ্ন

১. কবির অনুসরণে তিতাস নদীর একটি বর্ণনা লিখুন।
২. তিতাস নদীর ভাবার্থ লিখুন।

খ) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'এ আমার শৈশবের নদী' কে, কাকে, কেন বলেছেন?
২. বিলে কি কি পাখি দেখা যায়? ওরা কি করে?
৩. কবি কাকে যৌবনের প্রতীক বলেছেন? কেন বলেছেন?

গ) ব্যাখ্যা

১। জনপদে কি অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।
২। কী গভীর জলধারা ছড়াল সে হৃদয়ে আমার।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : করির অনুসরণে তিতাস নদীর একটি বর্ণনা লিখুন।

উত্তর : 'তিতাস' কবির শৈশবের নদী। কবি এ নদীকে দেখেছেন এক রকমের মুগ্ধতার দৃষ্টিতে। আপাতদৃষ্টিতে এ নদীর সঙ্গে বাংলাদেশের আর দশটি নদীর কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পার্থক্য আছে কবির দেখার দৃষ্টিতে।

জলের প্রভাবে সারাদিন নদীর পাড় ভাঙে, স্রোতের টানে পাক খায় নদীর ঘোলা জল। নৌকার পালে গতির প্রবাহ যৌবনের শক্তির মতো। নদীকে ঘিরে জনপদের কাজকর্ম চলে - কোলাহল জাগে। সবকিছু মিলে এ নদী কবির কাছে মায়াবী নদী। বারবার এ নদীর কাছে এসে কবি স্নিগ্ধ হয়েছেন নির্মল নিঃশ্বাসে। ঘাস-লতা-পাতার স্পর্শে কবি স্বর্গসুখ অনুভব করেছেন। শহরের শেষ প্রান্তে যখন কবি ফিরেছেন নিজগৃহে তখনও ঘুমের ঘোরে এ তিতাস নদীকেই অনুভব করেছেন। কবির ভাষায় -

'আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শরবী তিতাস
কী গভীর জলধারা ছড়াল সে হৃদয়ে আমার'

কবির সমগ্র চৈতন্যে জুড়ে আছে শৈশবের জলপ্রবাহ তিতাস নদী।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'এ আমার শৈশবের নদী' কে কাকে কেন বলেছেন?

উত্তর : 'এ আমার শৈশবের নদী' এ কবিতাংশটি কবি আল মাহমুদ রচিত "তিতাস" নামক কবিতা থেকে উদ্ধৃত। 'তিতাস' একটি নদীর নাম। এ নদীকে উদ্দেশ্য করেই কবি তাঁর শৈশবের নদী বলেছেন। আল মাহমুদের শৈশব কেটেছে তিতাস নদীর তীরে। এ নদীর স্নিগ্ধ জলধারা কবিকে দেহে ও মনে বেড়ে উঠর সাহচার্য দিয়েছেন। এখনও কবি নদীর কাছে এসেই জীবনের আনন্দকে অনুভব করেন। শৈশবের স্মৃতি বলেই তিতাসের উজ্জ্বল উপস্থিতি আছে মনের গহীনে। 'তিতাস' তাই চিরকাল কবির শৈশবের নদী।

প্রশ্ন ২ : বিলে কি কি পাখি দেখা যায়? ওরা কী করে?

উত্তরঃ কবি আল মাহমুদ তাঁর 'তিতাস' কবিতায় দূরের বিলে পাখিদের কথা বলেছেন। অদূরের বিলে থাকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক। এ পাখিরা বাংলাদেশের অতি পরিচিত পাখি। সব সময় এরা থাকে জলাশয়ের কাছে। কবি দেখেন ওরা উড়ে যায় অনেক দূরে-দূরে। মাছ শিকারি পাখিগুলো কবির দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে।

প্রশ্ন ৩ : কবি কাকে যৌবনের প্রতীক বলেছেন? কেন বলেছেন?

উত্তরঃ কবি আল মাহমুদ রচিত 'তিতাস' একটি অসাধারণ কবিতা। এ নদী কবির স্বপ্নের নদী - মায়াবী-নদী। তিতাস নদীর উদ্দাম গতিপ্রবাহে ছুটে যায় অসংখ্য নৌকা। পালে বাতাস লেগে অথবা স্রোতের টানে নৌকাগুলো দূর দিগন্তে দ্রুত মিলিয়ে যায়। এ চলকেই কবি যৌবনের প্রতীক বলেছেন। যৌবনের কোন কিছু না মানার, বাধাকে অতিক্রম করার একটি দুর্দান্ত শক্তি আছে। সেই রকম একটি দুর্দান্ত শক্তি নৌকার ছুটে চলা কবি এ নৌকাগুলোর গতিবেগে লক্ষ করেন। তাই কবি নৌকার এ ছুটে চলাকে যৌবনের প্রতীক বলেছেন।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. জনপদে কি অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি আল মাহমুদ রচিত 'তিতাস' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে তিতাস নদী সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

'তিতাস' কবির শৈশবের নদী। মায়াবী এ নদীর কাছে এসে কবি স্বস্তি ও আনন্দ পান। সমস্ত সত্তাকে ঘিরে রেখেছে এই নদী। জনপদে মানুষের কোলাহল জাগে বিচিত্র কর্মপ্রবাহে। আর চিরকাল জনপদ গড়ে উঠেছে নদী ও জলাশয়ের পাশে। তাই কবি বলেছেন জলপ্রবাহের স্রোত শুধু নয় - এ নদী জনপদের বিচিত্র কোলাহলের স্রোতকেও টেনে এনেছে। কিন্তু এ নদী কর্মময় জীবনের সুযোগ দিয়েছে বলে নয় - কবির কিছুই পাওনা নেই নদীর কাছে। যে শৈশব থেকে লালন-পালন করেছে তার কাছে কিছুই পাওয়ার থাকে না। তাই নদীর কাছেও কবি কিছু চান নি অথবা খোঁজেন নি।
তিতাসের সঙ্গে কবির যে সম্পর্ক মধুর, সাংসারিক দেনা-পাওনার মতো নয় - তাই কবি এ কথা বলেছেন।

২. কি গভীর জলধারা ছড়াল হৃদয়ে আমার

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কবি আল মাহমুদ রচিত 'তিতাস' নামক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে তিতাসের স্মৃতির কথা বলা হয়েছে।
'তিতাস' কবির কাছে একটি প্রিয়-নাম। এ নদীর নাম কবির শৈশরে এ মায়াবী নদীর কথা কোনদিন ভুলে যাননি। এ নদীর অস্তিত্ব তাঁর সমগ্র চৈতন্যে। যখন নদীর সান্নিধ্যে তার তীরে এসে বসেন তখন এক গভীর প্রশান্তি তিনি অনুভব করেন। কিন্তু যখন ফিরে যান আবাসে-শহরের শেষ প্রান্তে তখনও মায়াবী নদীর আমেজ তাঁর মনে থাকে। শুধু জাগরণে নয়, ঘুমের ভিতরেও এ নদীর অস্তিত্ব বিলীন হয় না। শবরী তিতাসের ঝিকিমিকি প্রভাব কবির সম্পূর্ণ অন্তরকে আপ্লুত করে রাখে।
মায়াবী 'তিতাসের' প্রতি কবির গভীর প্রেম ও আসক্তির কারণে তিতাসের স্মৃতি কবির সর্ব অবস্থায় চির অম্লান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

nq£c pÈl-Z
-j¡q¡Çjc j¢el¦ < ¡j¡e

কবি পরিচিতি

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল যশোর জেলার খড়কি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালে যথাক্রমে বি.এ (অনার্স) ও এম.এ পাশ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রথম ফেলো হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮-৮১ পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রধানত কবি ও গীতিকার। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা তাঁর কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি দেশ ও সমাজ সচেতন কবি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গবেষণায় কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে :

কাব্য : দুর্লভ দিন, শঙ্কিত আলোকে, বিপন্ন বিষাদ, প্রতনু প্রত্যাশা, ভালোবাসার হাতে, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি।

গবেষণা গ্রন্থ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিক ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি।

গান : অনির্বাণ।

২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'শহীদ স্মরণে' কবিতাটি কবির 'প্রতনু প্রত্যাশা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে কবিতাটি রচিত। দেশের জন্য বীর সন্তানদের অপরিমেয় আত্মত্যাগের কথা এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মুক্তিযুদ্ধের একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- শহীদ আসাদের বাবা-মায়ের একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

কবিতায় আর কী লিখব?
যখন বুকের রক্তে লিখেছি
একটি নাম
বাংলাদেশ।

গানে আর ভিন্ন কী সুরের ব্যঞ্জনা?
যখন হানাদারবধ সংগীতে
ঘৃণার প্রবল মন্ত্রে জাগ্রত

স্বদেশের তরুণ হাতে
নিত্য বেজেছে অবিরাম
মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড।

কবিতায় কী লিখব?
যখন আসাদ
মনিরামপুরের প্রবল শ্যামল
হৃদয়ের তপ্ত রুধিরে করেছে রঞ্জিত
সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
সেই রক্তাক্ত পতাকা।
আসাদের মৃত্যুতে আমি
অশ্রুহীন; অশোক; কেননা
নয়ন কেবল বজ্রবর্ষী; কেননা
আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন; কেননা আমার বৃদ্ধা মাতার
কণ্ঠে নেই আর্ত হাহাকার, নেই
অভিসম্পাত-কেবল
দুর্মর ঘৃণার আগুন; কোনো
সান্ত্বনাবাক্য নয়, নয় কোনো
বিমর্ষ বিলাপ; তাঁকে বলি নি
'তোমার ছেলে আসল ফিরে
হাজার ছেলে হয়ে,
আর কেঁদো না মা'; কেননা
মা তো কাঁদে না;
মার চোখে নেই অশ্রু, কেবল
অনলজ্বালা, দু চোখে তাঁর
শত্রুহননের আহ্বান।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

হানাদার – আক্রমণকারী। এখানে তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কথা বলা হয়েছে, **অবিরাম** – বিরাম বা ছেদ ছাড়া মেশিন গান, **মনিরামপুর** – যশোর জেলার একটি থানা, **রুধির** – রক্ত, **রঞ্জিত** – রং মাখানো, রক্তে রঞ্জিত,**আসাদ** – মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। কবির ছোঁ ভাই, **অশোক** – শোকহীন, **বজ্রবর্ষী** – যে বজ্র বা বিদ্যুৎ বর্ষণ করে, **আর্ত** – কাতর, **অভিসম্পাত** – অভিশাপ, **বিমর্ষ** – বিষণ্ন, **অনলজ্বালা** – আগুনের জ্বালা, **শত্রুহনন** – শত্রুকে হত্যা।

কাহিনী সংক্ষেপ

লাখো শহীদের বুকের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অসীম সাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধার দল হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছে। অবিরাম গোলাগুলি ও অস্ত্রের শব্দকে কবি সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদের বুকের রক্তে রাঙানো বাংলাদেশের পতাকা। আসাদের মৃত্যুতে কবি অশোক ও অশ্রুহীন। পুত্রহারা আসাদের মা-বাবা শোকে কাতর নন। তাঁদের দুচোখে আগুন ঝরছে - সেখানে শত্রু নিধনের আহ্বান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'শহীদ স্মরণে' কবিতাটির কবির নাম কী?
   ক. আব্দুল কাদির — খ. শামসুর রাহমান
   গ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — ঘ. শহীদ কাদরী

২. বুকের রক্তে কবি কী নাম লিখেছেন?
   ক. বাংলাদেশ — খ. পূর্ববাংলা
   গ. পাকিস্তান — ঘ. ভারত

৩. হানাদারবধ সঙ্গীতে তরুণদের হাতে কী বেজেছে?
   ক. হারমোনিয়াম — খ. সেতার
   গ. বোমা-কামান — ঘ. মেশিনগান-মর্টার, গ্রেনেড

৪. মনিরামপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম কী?
   ক. জাহাঙ্গীর — খ. আসাদ
   গ. কবীর — ঘ. নূর মুহাম্মদ

৫. আসাদের মৃত্যুতে কবির অনুভূতি কী?
   ক. বিষণ্ন — খ. কাতর
   গ. অশ্রুহীন ও অশোক — ঘ. প্রবল ঘৃণা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

গ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২. ক. বাংলাদেশ ৩. ঘ. মেশিনগান- মর্টার, গ্রেনেড
৪. খ. আসাদ ৫. অশ্রুহীন ও অশোক।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বাঙালি জাগরণের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

আসাদের রক্তধারায় মহৎ
কবিতার, সব মহাকাব্যের
আদি অনাদি আবেগ-
বাংলাদেশ-জাগ্রত।

আমি কবিতায় নতুন আর
কী বলব? যখন মতিউর
করাচির খাঁচা ছিঁড়ে ছুটে গেল
মহাশূন্যে টি-৩৩ বিমানের

দুর্দম পাখায় তার স্বপ্নের
স্বাধীন স্বদেশ মনে করে-
ফেলে তার মাহিন তুহিন মিলি
সর্বস্ব সম্পদ; পরম আশ্চর্য এক
কবিতার ইন্দ্রজাল স্রষ্টা হল,
তার অধিক কবিতা আর
কোন বঙ্গভাষী কবে লিখেছে কোথায়?
আমি কোন শহীদের স্মরণে লিখব?
বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর;
বাংলার লক্ষ লক্ষ আসাদ মতিউর আজ
বুকের শোণিতে উর্বর করেছে এই
প্রগাঢ় শ্যামল।

শহীদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি
বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর, বন্দর,
গঞ্জ, বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

শব্দভুক পদ্যব্যবসায়ী ভীরু বঙ্গজ পুঙ্গব সব
এই মহাকাব্যের কাননে খোঁজে
নতুন বিস্ময়। কলমের সাথে আজ
কবির দুর্জয় হাতে নির্ভুল স্টেনগান কথা বলে।
কবিতায় আর নতুন কী লিখব?
যখন বুকের রক্তে
লিখেছি একটি নাম
বাংলাদেশ।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

টি-৩৩ – এক প্রকার যুদ্ধ বিমান, **দুর্দম** – যাকে দমন করা যায় না, **ইন্দ্রজাল** – যাদু, **বায়ান্ন** – ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। ঐ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বেশ কয়জন শহীদ হন।

বাষট্টি – ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির রিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ করে ও আন্দোলন গড়ে তোলে। বাষট্টি এর এ শিক্ষা আন্দোলনেও অনেকে শহীদ হন, **উনসত্তর** – পাকিস্তানি অপশাসন ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিবৈষম্যের কারণে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। বাঙালির আত্মত্যাগ এ আন্দোলনেরও বৈশিষ্ট্য।

একাত্তর – ১৯৭১ সালে সশ্রস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এ দীর্ঘ সংগ্রামে অগণিত বাঙালি শহীদ হন, **প্রগাঢ়** – অতি গাঢ়।

পুষ্পিত – কুসুমিত, যার ফুল ফুটেছে, **সৌরভ** – সুগন্ধ।

কাহিনী সংক্ষেপ

মতিউর করাচির খাঁচা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। স্বপ্নের স্বাধীন দেশে পৌঁছাবার তাড়ায় ফেলে এল সর্বস্ব তার। কবিতার চেয়ে মোহনীয় এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হল। কিন্তু আসাদ, মতিউর শুধু নয়। কতজনের কথা স্মরণ করবেন কবি? বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তরে লাখো লাখো আসাদ-মতিউরের মত শহীদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলাদেশের রক্তিম পতাকা। সাতকোটি বাঙালির প্রাণের আবেগ ও মাধুর্যে সুরভিত আজ বাংলাদেশ। লক্ষ শহীদের হৃদয়ের শোণিতে বাংলাদেশ আজ স্বাধীনদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মতিউর কোন বিমানে উড়ে গেলেন?
   ক. মিগ-২৯ খ. টি-৩৩
   গ. হেলিকপ্টার ঘ. মিগ-২২

২. ভাষা আন্দোলন কত সালে হয়েছিল?
   ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৯৫৮ সালে
   গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

৩. বুকের শোণিতে কারা বাংলাদেশ উর্বর করেছে?
   ক. কৃষকেরা খ. পরিব্রাজকরা
   গ. মুক্তিযোদ্ধারা ঘ. রাজাকাররা

৪. কবিতা ইন্দ্রজাল কে সৃষ্টি করলেন?
   ক. আসাদ খ. মতিউর
   গ. অগণিত মুক্তিযোদ্ধা ঘ. জনৈক বীরশ্রেষ্ঠ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. টি-৩৩ ২. ক. ১৯৫২ ৩. গ. মুক্তিযোদ্ধারা ৪. খ. মতিউর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'শহীদ স্মরণে' কবিতা অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা দিন।
২. 'শহীদ স্মরণে' কবিতার মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'আমি কবিতায় নতুন আর কি বলব' - কবির নতুন কিছু বলার নেই কেন?
২. মায়ের চোখে শত্রু হননের আহ্বান কেন?
৩. মতিউর কে? তাঁকে আমরা স্মরণ করি কেন?

গ. ব্যাখ্যা

১. সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
   সেই রক্তাক্ত পতাকা
২. .... পরম আশ্চর্য এক
   কবিতার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হল -
   তার অধিক কবিতা আর
   কোন বঙ্গভাষী কবে লিখেছে কোথায়?

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'শহীদ স্মরণে' কবিতা অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের একটি বর্ণনা দিন।

উত্তর : "শহীদ স্মরণে" মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের একটি অসাধারণ কবিতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জীবনঘনিষ্ঠ অসামান্য একটি চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিশ্বের এক অসামান্য ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। জাতির জীবনে কখনও কখনও মহাজাগরণের শুভলগ্ন আসে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাগরণের এক প্রতীক। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত জাতি একাত্তরের যুদ্ধে সমগ্র চৈতন্য নিয়ে প্রতিরোধের স্পৃহায় জেগে উঠেছিল। একাত্তরের নবজাগরণ এসেছিল বায়ান্ন, বাষট্টি ও উনসত্তরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়।

স্বাধীকারের আন্দোলনে রত বাঙালি জাতির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাক হানাদার বাহিনী। নিরস্ত্র বাঙালিকে তারা চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি জাতি সেদিন জেগেছে। তরুণরা সেদিন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। দারুণ ঘৃণায় শত্রু হননের গানে মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড গর্জন করে উঠেছিল। কবি মুক্তিযুদ্ধের এ চিত্রকল্পকে অসামান্য দরদী কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর সামানাসামনি যুদ্ধ করেছে তারা জানত না - স্বাধীনতা কতদূরে। কিন্তু স্বাধীনতা ধীরে এগিয়ে আসল। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে। শ্যামল স্নিগ্ধ মাটিতে আসাদ এবং তার মত অমীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধার হৃদয়ের তপ্তরক্তে রঞ্জিত বাংলার পতাকা। কবির ভাষায় -

"সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
সেই রক্তাক্ত পতাকা।"

অনুজ আসাদের মৃত্যুতে কবি অশ্রুহীন, অশোক। বৃদ্ধ পিতার সর্বাঙ্গে পশুদের প্রহারের দাগ। আসাদের মা নির্বাক। মা-বাবার চোখে ঘৃণা-শত্রুহননের আহ্বান। দূর বিদেশে মতিউরের হৃদয়-মন স্বদেশের জন্য কেঁদে ওঠে। দূর আকাশের নীলিমায় হারিয়ে যায় মতিউর। পিছনে পড়ে থাকে স্নেহের সংসার। ভালবাসার নীড়। কিন্তু শত্রুর আঘাতে ভেঙে পড়ে মতিউরের স্বপ্নসাধ। এমনি করে ঘাতক পশুদের বিরুদ্ধে নেমেছিল যে যেখানে ছিল।

কবি আসাদ-মতিউর, আর এমনি হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের মধ্যে জন্ম নিয়েছে একটি দেশ-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কবিতার চেয়ে মোহনীয়, স্বপ্নের চেয়ে রঙিন এক মহাকাব্যের স্রষ্টা এই মুক্তিযোদ্ধারা। তাই কবি বলেন-

ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা।
আর কোথাও দেখি না এরচেয়ে"।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। কবি 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় সেই ঐতিহাসিক সূত্রের সঙ্গে একাত্তরের সংগ্রামের মিলন ঘটিয়েছেন। খুব সংক্ষিপ্ত অবয়বে, শব্দচয়নের দক্ষতায় মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণীকে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : "আমি কবিতায় নতুন আর কী লিখব? কবির নতুন কিছু লেখা নেই কেন?

উত্তর : "শহীন স্মরণে" কবিতায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছেন - কবিতায় আর কি লেখার আছে? কবিরা তাঁদের লেখনীতে স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করেন? কিন্তু বাংলাদেশের কবিদের আর কি নতুন কিছু বলার বা লিখার আছে? বুকের রক্ত দিয়ে স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করেছে শহীদ আসাদ-মতিউরেরা। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে সবুজ শ্যামল প্রান্তরে, নীল আকাশের দিগন্ত রেখায় হারিয়ে গেছে যে বীর যুবক, তাদের চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কে দেখেছে? হৃদয়ের তপ্ত শোণিতে রাঙিয়ে এরা ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা। সৃষ্টির সৌরভে নতুন দেশের মানচিত্র এঁকেছে। এটাই তো পৃথিবীর মহত্তম কবিতা। তাই কবি বারবার বলেছেন - কবিতায় নতুন কিছু লিখবার নেই।

প্রশ্ন ৩ : মতিউর কে? তাঁকে আমরা স্মরণ করি কেন?

উত্তর : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় মতিউর রহমানের উল্লেখ করেছেন। মতিউর রহমান আমাদের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের একজন। মতিউর রহমান তদানীন্তন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ছিলেন। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের প্রতি তীব্র গণআন্দোলন শুরু হয়।

২৫শে মার্চের গণহত্যা মতিউরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ১৯৭১ সালের ২০শে অক্টোবর পাকিস্তানের একটি বিমান ঘাঁটি থেকে টি-৩৩ বিমান নিয়ে ভারত সীমান্তের দিকে তীব্র গতিতে উড়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য মতিউরের। সীমান্ত অতিক্রমের আগেই বিমানটি ধ্বংস হয়। মতিউর শাহাদতবরণ করলেন - কিন্তু সৃষ্টি করলেন এক অমর কাহিনী। মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ - তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
সেই রক্তাক্ত পতাকা।

উত্তর : আলোচ্য অংশটি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত "শহীদ স্মরণে" কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন - তার বুকে উড্ডীন লাল সূর্যখচিত পতাকা। কিন্তু এ পতাকা সহজে আমাদের কাছে ধরা দেয়নি। লাখো মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি এ পতাকা। হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করতে যেয়ে শতশত তরুণ বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে অকাতরে - । সেই শহীদের পবিত্র রক্তে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতার পতাকা।

সংগ্রামের কাহিনী, আত্মত্যাগের সেই চির অম্লান কাহিনীকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশের পতাকা চির উজ্জ্বল থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।